সাজাইবার ভাষা আছে। তাঁহার 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' এই দুইটি শক্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়াছি। বাস্তবিক দার্শনিক প্রতিভা আছে বলিয়া তাঁহার কাব্যগ্রন্থ শুদ্ধ মনোরঞ্জন না করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিতেছে। পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, অনেককেই বঙ্কিম বাবুর মতে আসিতে হইবে। ইহা তাঁহার উপন্যাসের কম প্রশংসা নহে!

কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রধান ঘটনা গুলি এই:—১। রোহিণীর উইল চুরি। ২। রোহিণীর আসক্তি। ৩। রোহিণীর আত্মহত্যার চেষ্টা—গোবিন্দলালের আসক্তি। ৪। গোবিন্দলালের কলঙ্ক রটনা। ৫। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু ও উইল। ৬। গোবিন্দলালের অনুসন্ধান। ৭। রোহিণীর মৃত্যু। ৮। ভ্রমরের মৃত্যু—গোবিন্দলালের মৃত্যু।

ঘটনায় দুই প্রকার প্রতিভা প্রকাশিত হইতে পারে। এক প্রকার, অতি স্বাভাবিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাহা সুন্দর রূপে বর্ণনায়। অন্য প্রকার, তাহার সহিত মূল গ্রন্থের সম্বন্ধ প্রকাশে। একটি ঘটনার বর্ণনায়, আর একটি, ঘটনার উদ্দেশ্যে। আমরা একটি একটি করিয়া ঘটনাগুলি সমস্ত সমালোচনা করিব।

১। রোহিণীর উইল চুরি কিছু অসম্ভব ঘটনা বলিয়া বোধ হয়। অত বড় লোকের ঘরে যে এইরূপ ভাবে চুরি হইতে পারে, তাহা পাড়াগাঁয়ের লোক ভিন্ন অন্যে বিশ্বাস করিতে পারে না। যাহা হউক, একটু খানি যদি অবিশ্বাস যোগ্যও কিছু থাকে, ঘটনা-কৌশল দেখিলে তাহা বিস্মৃত হইতে হয়। বুড়া কৃষ্ণকান্তের আফিঙ্গ খাওয়াটা এইজন্যই হইয়াছিল।

এই ঘটনার অন্য দিক্‌টি বড় সুন্দর হইয়াছে। রোহিণী স্ত্রীলোক হইয়াও যে কারণে সাহসী হইয়া এরূপ কার্য্য করিতে আসিয়াছিল, তাহা বেশ সঙ্গত হইয়াছে।* রোহিণী বাল-বিধবা—যুবতী, আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণা। তাহার নিকট জগতের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের জিনিস—স্বামী। হরলাল তাহাকে সেই সুখের জিনিস দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। হরলালকে সে পতিরূপে পাইবে, এ প্রলোভন তাহার নিকট অত্যাজ্য। আবার এই ঘটনাটিতে রোহিণী-চরিত্রের মৌলিক ভাবটিও বেশ খুলিয়াছে। তাহার দুর্দ্দমনীয়া বাসনা ইহা অপেক্ষা আর কিসে অধিকতর ব্যক্ত হইত? এই ঘটনাই আবার পরোক্ষভাবে গোবিন্দলালের প্রতি তাহার আসক্তির অন্যতম কারণ—এই ঘটনা ধরিয়াই আবার গোবিন্দলালের নিকট সে তাহার চিত্তখানি খুলিয়া দেখাইতে পারিয়াছিল। রোহিণীর উইল চুরি তাহার জীবনের অন্যতর প্রধান ঘটনা। যে ঘটনার সহিত গ্রন্থের এতদূর সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার কল্পনা প্রশংসনীয় নয় কি? উপন্যাস লিখিতে, এই গুলি বড় আবশ্যক।

২।—রোহিণীর আসক্তিতে অস্বাভা-

---

* এ সম্বন্ধে প্রথম সংস্করণে যাহা আছে, তাহা অপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণের ঘটনা অধিকতর সঙ্গত, সুতরাং সুন্দর।

বিৎ কিছুই নাই। অমন লাস্যপারবর্তী রমণী গোবিন্দলালকে দেখিয়া আসক্তা হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? এরূপ তর্ক উঠিতে পারে যে, রোহিণী গোবিন্দলালকে ত আরও দেখিয়াছে, অন্য দিন ত এরূপ ঘটে নাই? তাই গ্রন্থকার কতকগুলি কৌশল গ্রহণ করিলেন। প্রথম, সেই কোকিল। তোমরা যাহাই বল না কেন, আমরা কোকিলের এ ক্ষমতাটুকু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কোকিলের স্বর যে স্বপ্নের মত কতকগুলি কথা মনের ভিতর জাগাইয়া দেয়, তাহা আমরা যেন অনুভব করিয়াছি। গ্রন্থকার এ ভাবটুকু অতি সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন কোকিলের ডাক শুনিলে মনে হয় যেন "কি যেন হারাইয়াছি—যেন তাই হারাইবাতে জীবন-সর্ব্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে—যেন তাহা আর পাইব না। যেন কি নাই, কি যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি—কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল—সুখের মাত্রা যেন পূরিল না—যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হইল না।" এই বর্ণনাটি বড়ই সুন্দর। সত্যে কোকিল আমাদিগের আর্য্যকবিগণকে এত মাতাইয়া তুলে নাই। অনন্তকার্য্যব্যাপৃত মনে অতর্কিত রূপে কোকিলের ডাকে মানব মাত্রেরই মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হয় তবে, কাহারও বা পবিত্রভাবে, কাহারও বা অপবিত্র ভাবে। বাস্তবিক পক্ষে চিন্তাটি পবিত্র ভাবেই উৎপন্ন হয়। যে আকাঙ্ক্ষাটি মনে উদয় হয়, তাহা পার্থিব বিষয়ের নহে—কিন্তু কুলোকে তাহা পার্থিব বিষয়ে যুক্ত করিয়া সে আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে। ঐ সময়ে একটি আর্য্য ঋষি থাকিলেও, তাঁহার মনে ঐরূপই ভাব উঠিত, কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষার অর্থ, তাঁহার সৌন্দর্য্যের অর্থ, তাঁহার হারাণ রত্নের অর্থ, অন্যরূপ হইত। সে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা, সে অনন্ত সৌন্দর্য্য, সে হারাণ রত্ন এ জগতের নহে। তাই বলিতেছিলাম—এ কোকিলের কথায় বড়ই কবিত্ব আছে। শুদ্ধ এইটুকু লিখিয়া এক জন কবি নামে খ্যাত হইতে পারে। ইহা একটি খণ্ড কবিতা। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে, এরূপ খণ্ড কবিতার অভাব নাই। দ্বিতীয়, সেই সময়ে সেইরূপ ভাবে গোবিন্দলালকে দেখা। রোহিণীর মন এখন উতলা হইয়া উঠিয়াছিল—জল-নিমগ্ন ব্যক্তির আকুলতার ন্যায়, ইহার মনে, প্রণয়-বাসনা পরিতৃপ্তির একটা আকুলতা উঠিতেছিল। এই সময়ে সে দেখিল "সুনীল, নির্ম্মল অনন্ত গগন—ইত্যাদি (৮০ পৃঃ দেখ) কি সুন্দর কবিত্ব! কাব্যাংশে এ স্থলটী যে কোনও কাব্যের যে কোন স্থলের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। সেই কলসী ভাসানেই বা কি সুন্দর কবিত্ব রহিয়াছে! আমরা বেশি বই পড়ি নাই সত্য কিন্তু যাহা পড়িয়াছি, এরূপ ভাষায় এরূপ ভাব-ঘটনার সমাবেশ বর্ণিত দেখি নাই। অন্য কারণ না থাকিলেও রোহিণীর মত কামিনীর গোবিন্দলালের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার স্বাভাবিকতা ইহাতেই দেখান হইত। তৃতীয়, সেই উইল চুরি—সেই "গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর

বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ"। এ সকল কথা আর অধিক বলিবার দরকার নাই। গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর আসক্তি জন্মাইতে কবিবরের এতগুলি চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।

৩। রোহিণীর জল-নিমজ্জন ঘটনা কবির আর একটি কাব্য কৌশল। ঘটনাটি যেমন স্বাভাবিক, তেমনই আবার উদ্দেশ্য যুক্ত। রোহিণীকে যদি অমন করিয়া তাঁহারই জন্ত জলনিমগ্না না দেখিতেন, যদি অমনি করিয়া তাহাকে না বাঁচাইতে হইত, তবে গোবিন্দলালের মন কখনই টলিত না। এ ঘটনাটিও মূল গ্রন্থের একটি অতি প্রধান ঘটনা। ইহার ফল গোবিন্দলাল চরিত্রে যাহা হইয়াছিল, তাহা আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি।

৪। গোবিন্দলালের কলঙ্ক রটনাটি-তেও কবিত্ব আছে। এ কলঙ্ক কিরূপে প্রথম রটনা হয়, তাহা আমরা জানি না। ভ্রমর ক্ষীরি চাকরাণীর নিকটেই ইহা প্রথমে শুনিয়াছিল। এইরূপ কথা এই রূপ শ্রেণীর লোকেরই মুখে ভাল শোভে। তার পরে সে যেরূপ করিয়া ইহা মেয়ে মহলে প্রচারিত করিল, এইরূপ করিয়াই প্রায় এই সমস্ত কথা সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়া থাকে। তার পরে গ্রন্থকার লিখি-য়াছেন—"বিনোদিনী সুরধুনীর পর, [illegible]সুন্দরী, শ্যামা, কামিনী, রমণী * ** প্রভৃতি [illegible] আসিয়া একে একে, দুইয়ে দুইয়ে, তিনে [illegible], দুঃখিনী বিরহ কাতরা বালিকাকে জানাইল [illegible] তোমার স্বামী রোহিণীর প্রণয়াসক্ত। কেহ [illegible] কেহ [illegible], কেহ বর্ষীয়সী, কেহ বা বালিকা, সকলেই আসিয়া ভ্রমরকে বলিল, 'আশ্চর্য্য কি? সেজ খুবুর রূপ দেখে কে না ভোলে। রোহিণীর রূপ দেখে তিনিই না ভুলিবেন কেন? কেহ আদর করিয়া, কেহ চিবাইয়া, কেহ রসে, কেহ রাগে, কেহ সুখে, কেহ দুঃখে, কেহ হেসে, কেহ কেঁদে, ভ্রমরকে জানাইল যে, ভ্রমর তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

"গ্রামের মধ্যে ভ্রমর সুখী ছিল। তাহার সুখ দেখিয়া সকলেই হিংসায় মরিত—কালো কুৎসিতের এত সুখ?—অনন্ত ঐশ্বর্য্য—দেবীদুর্ল্লভ স্বামী—লোকে কলঙ্কশূন্য যশ—অপরাজিতাতে পদ্মের আদর? আবার তার উপর মল্লিকার সৌরভ? গ্রামের লোকের এত সহিত না। তাই পালে পালে, দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনী সঙ্গে করিয়া, সম্বাদ দিতে আসিল, 'ভ্রমর তোমার সুখ গিয়াছে'।" ইহার সৌন্দর্য্য কি আবার ব্যাখ্যা করিতে পারে? এরূপ ঘটনা ত আমরা জানি, কিন্তু এরূপ ভাষায় এরূপ স্থলে, এরূপ করিয়া বর্ণনা করিতে পারি কি? আমাদিগের এইখানে পোপের কথা মনে পড়িল।

True wit is nature to advantage dresse'd,

What oft was thought, but ne'er so well expresse'd;

Something whose truth convinced at sight we find

What gives us back the image of our mind.

এই কলঙ্ক রটনাতেই ভ্রমরের চিত্র [illegible] তাহার পতি প্রেম খুলিয়াছে, তাহার হৃদয়ের অভিমানটুকু খুলিয়াছে।

রোহিণীর ভ্রমরের নিকটে পাঠানেও গ্রন্থকার বুদ্ধিমত্তা দেখাইয়াছেন। রোহিণীকে ঐরূপ ভাবে না দেখিলে, কি ভ্রমর অমন করিয়া স্বামীর নিকট পত্র লিখিতে পারে?

৫। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু ঘটনাটি, উইলের ধারা পাটাইবার জন্য। পুস্তকখানির নাম "কৃষ্ণকান্তের উইল" দেওয়া হইয়াছে, সেই উইলের সহিত ভ্রমর-গোবিন্দলালের জীবনের এক সম্বন্ধ দেখাইতে হইবে, তাই কৃষ্ণকান্তের ঐ সময়ে মৃত্যু ঘটিল। মৃত্যু বর্ণনা স্বাভাবিক—ইহার উদ্দেশ্যও অসার নহে।

৬। গোবিন্দলালকে অনুসন্ধান করার ঘটনায় গ্রন্থকার ডিটেকটিভ্‌ পুলিসের অনুসন্ধানী বুদ্ধি প্রকাশ করিয়াছেন। ঘটনাটি বেশ মানাইয়াছে। ইহাতেও নব প্রশংসার বিরল নাই।

৭। রোহিণীর মৃত্যু যাহাতে ঘটিল, তাহা অতি সুন্দর দেখান হইয়াছে। এই কারণেই প্রায় দুশ্চারিণীদিগের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ইহাতে রোহিণীর ভালবাসার প্রকৃতি ও গোবিন্দলালের ভালবাসার গঠন, সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৮। ভ্রমরের মৃত্যু বর্ণনা বড়ই মনঃপ্রাহী হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্যের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

৯। গোবিন্দলালের মৃত্যুতেও কবিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। তাঁহার উন্মত্ততায়, তাঁহার ঐরূপ করিয়া বারুণী পুকুরের জলে ডুবিয়া মরায় গ্রন্থকারের আশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

দেখিলে পাঠক, কৃষ্ণকান্তের উইলখানি? দেখিলে ইহার উদ্দেশ্য, দেখিলে সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ ইহার চরিত্র গুলির বিকাশ? দেখিলে, সেই চরিত্রগুলির বিকাশার্থ ইহার ঘটনার সমাবেশ? দেখিলে সেই ঘটনা বর্ণনার্থ ইহার ভাষার রচনা? দেখিলে ইহার বক্তব্যগুলি? একমাত্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লিখিতে পারিলে আমরা বঙ্কিম বাবুর সমকক্ষ বলিয়া মনে ভাবিতে পারিতাম। আর কি বলিব?

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। ভ্রমর। *

এখন ভারতে যদি গৌরব করিবার কোন জিনিস থাকে, তবে তাহা রমণী-হৃদয়। আর্য্যরমণী ভারতের কেন, সমস্ত জগতের—সমগ্র সৃষ্টির গৌরবের বস্তু। নারীজাতি যে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, তাহা ভারতবাসী যেমন সহজে বুঝিতে পারে, এরূপ আর কেহই নহে। চিতোর রাজপুতনার কথা ছাড়িয়া দেও, পাতিত বঙ্গগৃহে সতী, সাবিত্রী অভাব নাই। সৌভাগিনী বঙ্গলা এ সম্বন্ধে প্রতীচ্য-ক্রোড়ে স্থান পাইবার অযোগ্য নহে।

আজ যে রমণী মূর্ত্তিটি শিরোনামে স্থাপন করিয়া আমরা এ প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি, বুঝি ইহাই বাঙ্গালার শেষ 'আপনার ধন'। প্রভাতের শুকতারার ন্যায় বাঙ্গালার এই একটি তারকা যেন নীরবে শূন্য-ক্রোড়ে মিলাইয়া যাইতেছে।

---

* গোবিন্দলাল ও রোহিণীসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে যথেষ্ট মনে করি। কিন্তু ভ্রমর সম্বন্ধে আরও কিছু বলা উচিত বোধ করিলাম।

পাশ্চাত্য সভ্যতার দিনে, যাহার দিগ্‌-দিগন্ত, নেত্রসুখকর আলোক শুধু আমাদিগের নেত্রগোচর হইতেছে না। অজ্ঞানে অনাদরে, সুরবালাগণ যেন ম্লানমুখী হইয়া ধীরে ধীরে অন্তর্দ্ধান হইতেছেন! বখ্‌তিয়ার খিলিজি কেবল বঙ্গদেশই জয় করিয়াছিল—আজ ইংরাজ-রাজ আমাদিগের রুচি পর্য্যন্ত জয় করিতেছে! এ দুঃখ কি রাখিবার?

ভ্রমর—দুঃখিনী, আর্য্যরমণী ভ্রমর—এ কাচরশ্মির প্রধান আহুতি। একটি সরলা আর্য্যবালাকে আধুনিক পাশ্চাত্য সংশিক্ষায় দীক্ষিতা করিলে, যেরূপ হইয়া থাকে, গোবিন্দলালের শিক্ষার ফলে ভ্রমর তাহাই হইয়াছিল। ভ্রমরের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে, "স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র উপাস্য দেবতা, 'শান্ত অনন্ত', স্বামীই ইহকাল, স্বামীই পরকাল" ভ্রমর বাল্যে শিক্ষা করিয়াছে, "ধর্ম্ম স্বামী হইতেও বড়—স্বামী ধর্ম্মবিরোধী হইলে অপরিত্যাজ্য নহে"। ভ্রমরের অন্তঃকরণে পূর্ণমাত্রায় সাবিত্রীর উপকরণ বিরাজিত রহিয়াছে, কিন্তু ভ্রমরের শিক্ষায় আবার পূর্ণ মাত্রায় পাশ্চাত্য সাম্য ও স্বাধীনতা বর্ত্তমান দেখিতে পাই। এ দুইয়ের সংমিশ্রণ বুঝি 'মধু সাগর' জাব, তাই ভ্রমরেও তাহা শুভফল উৎপাদন করিতে পারিল না। আর্য্যরমণী ভ্রমর তাই সে শিক্ষার অত্যাচারে এ জগত হইতে পলায়ন করিল। সূর্য্যমুখীর পরে ভ্রমরকেও আমরা একটি আর্য্যরমণী বলিয়া চিনিলাম—কিন্তু ইহার পরে যে কি হইবে, কে বলিতে পারে? যে দিন শিক্ষা ভ্রমরকে পরাস্ত করিতে পারিবে, সেই দিনই এ লক্ষ্মীধাম ভারতভূমি লক্ষ্মীহীনা হইবে। তাই বলিতেছিলাম, বুঝি ভ্রমর এ দেশের শেষ 'আপনার ধন'। এ ভ্রমরে শিক্ষার আর একটু প্রভাব বিস্তার করিলেই আর তাহাকে আর্য্যরমণী বলিয়া চিনিতে পারিব না।

ভ্রমরের স্থূল পরিচয় আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। ঐ যে বালিকা মূর্ত্তিটি হাসিতে হাসিতে স্বামিপ্রেমে বিভোর হইয়া স্বামীর সহিত, বালিকার ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে—সংসার ভুলিয়া, জ্ঞান ভুলিয়া, আপনার উদ্বেলিত তরল হৃদয়টি প্রেমের মধুর জ্যোতিতে বিকীর্ণ করিয়া স্বামীর জ্ঞান-অভিমানপূর্ণ পুরুষোচিত কঠিন হৃদয়টিকে আস্তে আস্তে দ্রবিত করিতেছে, অকস্মাদকে আত্মবিস্মৃতিময় করিয়া তুলিতেছে, উহার নামই 'ভ্রমর'। ইহাতে যদি সম্যক না চিনিয়া থাক, ঐ দেখ, ঐ যে একটি কোমলপ্রাণা বালিকা প্রতিবাসিনীবর্গের মুখে স্বামীর কলঙ্ক-কথা শুনিয়া সন্দেহবিষে জর্জ্জরিতা হইয়া মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায় ছট্ ফট্ করিয়া বলিতেছে 'কে ওগো! শিক্ষক! ধর্ম্মজ্ঞ! আমার একমাত্র সত্যস্বরূপ! হে সন্দেহভঞ্জন! প্রাণাধিক! আজি কাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিব, এ কথা কি সত্য? আজি আমার সন্দেহ ভঞ্জন কে করিবে? ইত্যাদি' উহার নামই 'ভ্রমর'। ইহাতেও যদি তাহাকে না চিনিয়া থাক, তবে ঐ দেখ ঐ যে শীর্ণশরীরা, স্বামিবিরহবিধুরা কামিনীটি রুগ্নশয্যায় শায়িত রহিয়াছে, ঐ যে কামিনীটি স্বামীর চিন্তায় দুর্দ্দান্ত যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া স্বামীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করত প্রফুল্লচিত্তে প্রাণত্যাগ করিতেছে, উহাই আমাদিগের সেই 'ভ্রমর'। ভ্রমরের অ-

অধিক পরিচয় দিবার প্রয়োজন দেখা যায় না।

ভ্রমরের স্বামিপ্রেম বলিয়া উঠিতে পারি না। আমরা তাহা বর্ণনা করিতেও এখানে বসি নাই। আমাদিগের উদ্দেশ্য, আমাদিগের সমাজের সহিত ভ্রমরের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা; আমরা এখন তাহাই করিব।

বাল্যকাল হইতে স্বামীর সহবাসে থাকিয়া স্বামীর শিক্ষাফলে ভ্রমর সুসংস্কৃতা কাঞ্চনখণ্ডের ন্যায় চতুর্দ্দিকে শোভা বিকীর্ণ করিতেছিল। যেন একটি স্বর্ণ প্রদীপ বিদেশীয় মনোহর কাচাবরণ মধ্যস্থ হইয়া অপূর্ব্ব মিশ্রিত জ্যোতিতে আমাদিগের নয়ন জুড়াইতেছিল। স্বামীর সহিত ভ্রমরের সেই রূপ ভাবে আবদারও ক্রীড়া সেই বিদেশীয় আবরণের অঙ্গ বিশেষ, আর তাহার ভক্তিমাখা ভালবাসা, পতিময় প্রাণ সেই স্বর্ণ প্রদীপ।

ভ্রমরকে ভাবিতে সূর্য্যমুখীকে মনে পড়ে। কিন্তু সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর এক নহে। সূর্য্যমুখীর নিকট স্বামিসেবা ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম ছিল না। স্বামিসুখ ভিন্ন তাহার জীবনের অন্য লক্ষ্য ছিল না—স্বামীই তাহার ইহকাল, স্বামীই তাহার পরকাল। ভ্রমর স্বামীর সুখই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করিত না—অথবা স্বামী যাহাতে সুখী মনে করিতেন, ভ্রমর ঠিক তাহাতে তাঁহার সুখ মনে করিত না। স্বামীর ধর্ম্ম, স্বামীর সুনাম, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রই তাহার নিকট সমধিক আদরের জিনিস। দুইটিই সুন্দর। দুইটিই পূর্ণ বিকশিত, সুতরাং দুইটিই সুন্দর। স্বামীর প্রত্যেক কল্পিত সুখের জন্য আত্মবিসর্জ্জনও সুন্দর, আবার স্বামীর সেকুল সুখের উপাদান—তাহার হৃদয়ের দিকে একমাত্র লক্ষ্য রাখাও সুন্দর। সহজে কে বলিবে, সূর্য্যমুখী সুন্দর, না, ভ্রমর সুন্দর? আমাদিগের সমাজে ভ্রমরই ভাল শোভে, না, সূর্য্যমুখীই ভাল শোভে? সহজে ইহা বলা যায় না।

আমরা এসম্বন্ধে অনেক ভাবিয়া দেখিলাম যে, ভ্রমর সূর্য্যমুখীর তুলনায় কিছু ক্ষীণপ্রভ। ইহার কারণ এই যে, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে ভ্রমরের রূপমুখখানিতে একটি কলঙ্ক পরিদৃষ্ট হয়। হাঁ, কলঙ্ক বই কি?—যাহার বিদ্যমানতা ভ্রমরের সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর হৃদয়-দেশে ভাল শোভিল না, প্রত্যুত কুৎসিতই দেখাইল, তাহাকে কলঙ্ক বলিব না তবে কি বলিব? সেই কলঙ্কটি ভ্রমরের ধর্ম্মাভিমান, প্রেমাভিমান বা সম্যক্ আত্মগুণবোধ। যখন—ভ্রমর বিশ্বাস করিল যে, গোবিন্দলাল ধর্ম্মপথ-স্খলিত হইয়াছেন, তাহার সহিত বিশ্বাস-ঘাতকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, তখন ভ্রমর স্বামীর নিকট পত্র লিখিল "যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য ইত্যাদি"। আবার যখন গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করিবার পরে ভ্রমরকে পত্র লিখিলেন, ভ্রমর তদুত্তরে 'সেবিকা' পাঠ লিখিল না। ইহা এক প্রকার ধর্ম্মাভিমান বা ধর্ম্মের গোঁড়ামি। ইহাই সেই অন্যথানির্ম্মল ভ্রমর-চরিত্রে একমাত্র সুতরাং অতি উজ্জ্বল কলঙ্ক।

এ কথা যে অনেকের মতের সহিত মিলিবে না তাহা জানি। এক দল লোকে বলিবেন "বেশ ত, ইহাতে ক্ষতি কি; সদ্গুণ দেখিলে ভক্তি করা উচিত বটে, কিন্তু স্বামীকে পরদারনিরত দেখিলেও

কি তাঁহাদের ভক্তি রাখিতে হইবে ? ইহা হিন্দুদিগের একটি ভয়ানক কুসংস্কার। আমরা দেখাইতে চাহি যে এটি কুসংস্কার নহে—অতি সুন্দর সংস্কার। হিন্দুদিগের নিকট 'পাপ' ও 'পাপী' এক কথা নহে। পাপকে ঘৃণা করিতে পার কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিতে নাই। পাপীকে যে ঘৃণা করে, সে ধর্ম্মাভিমানী। তাহার মনে মনে ধার্ম্মিক বলিয়া একটা অহঙ্কার আছে। এইটি আমাদিগের মতে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। ভ্রমর যখন স্বামীকে ভক্তির অযোগ্য পাত্র মনে করিতে ইচ্ছা করিতেছিল, তখন সে তাহার স্বামীকে তদপেক্ষা নীচ মনে করিয়াছিল। অন্যকে নীচচক্ষে দেখিয়া আপনাকে মহত্তর ভাবা কি ভাল ? কি জানি, 'ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ' ইহার পর ভ্রমরের আরও এক কারণে গোবিন্দলালের প্রতি ভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করা উচিত ছিল—যে কারণে জন্মদাতা পিতা অসৎ হইলেও পুত্রের নিকট সর্ব্বদা ভক্তির পাত্র। গোবিন্দলাল ভ্রমরের গুরু। স্বামীমাত্রই এ অর্থে স্ত্রীর চিরভক্তির পাত্র।

যাহা বলা হইল, তাহা বিষয়টির মূল সম্বন্ধে; ফল সম্বন্ধেও কিছু বলিবার আছে। ভক্তি অপাত্রে ন্যস্ত হইলেও তাহা নিষ্ফল হয় না। ভালবাসার ন্যায় ইহাও জগৎব্যাপী হওয়া উচিত। এরূপ অবস্থায় স্বামী, যে স্ত্রীর কত দূর ভক্তির পাত্র, তাহা বলা যায় না। বিশেষ, যে সমাজে স্ত্রীর সকল শিক্ষাবই গুরু স্বামী, যে সমাজে স্বামীর সহিত স্ত্রীর বিচ্ছিন্ন হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, সে সমাজে স্ত্রীর স্বামিভক্তি একটি অতিশয় প্রয়োজনীয় জিনিস। যে পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত না হইবে, যে পর্য্যন্ত পুরুষ ও স্ত্রীজাতির উন্নতি সম্বন্ধে অনুপাত এইরূপই থাকিবে, যে পর্য্যন্ত আইনের সাহায্যে স্ত্রী স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন না হইতে পারিবেন—অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজ এ সম্বন্ধে হিন্দুই থাকিবেন, স্ত্রীলোকের স্বামিভক্তি না থাকিলে দেশ উৎসন্ন হইবে। তবে, হিন্দুসমাজ যখন উক্তরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে, তখন ইহা মঙ্গলকর হইলেও হইতে পারে; কারণ, কিস্ সুস্থশরীরে প্রাণঘাতিক হইলেও, অনেক ব্যারামের ঔষধও বটে।

আর যদি তর্কে পরাস্ত হইয়া স্বীকার করিতে হয় যে, ভ্রমরই বাস্তবিক আদর্শ রমণী, ভ্রমরের ধর্ম্মাভিমান ধর্ম্মের একটা অপরিহার্য্য পরিণাম; বলিব, ভ্রমর স্বর্গে বসিয়া তাহার শোভা সম্পাদন করুন—এখানে সূর্য্যমুখীকেই আমরা চাহি। বিদ্যুৎ দেখিতেই ভাল—দয়াহীন ন্যায়পরতা শুনিতেই ভাল। ইহার সহিত সংস্পর্শ আমরা চাহি না। ভ্রমরকে বরং দূরে রাখিয়া পূজা করিব। সকল জিনিসেরই দেশ, কাল, পাত্র ভেদে আদরের তারতম্য হইয়া থাকে। আমাদিগের এ দেশে তাই ভ্রমর অপেক্ষা সূর্য্যমুখীরই আদর অধিক হওয়া উচিত। আমাদিগের সাবধান হইয়া দেখা উচিত যেন সূর্য্যমুখীগণ ভ্রমর না হইতে পারেন। কিন্তু ইহা কি স্বার্থপরতা ? সঙ্কীর্ণতা ? কে বলিবে ?

২। কৃষ্ণকান্তের উইল।

এক একটি করিয়া 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' প্রধান চরিত্রগুলি আমরা যথাসাধ্য

বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইয়াছি—এখন তৎসম্বন্ধে আমাদিগের গুটিকতক কথা বলিতে হইবে

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমবাবুর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মধ্যেও উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য। এইরূপ উপকরণ লইয়া, অতি অল্প উপন্যাসই তিনি লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে যুদ্ধ নাই, বিগ্রহ নাই, আশ্চর্য্য কোন ঘটনাও নাই। ইহাতে আছে কেবল কয়েকটি চরিত্র ও তাহা স্ফুর্ত্তি পাইবার জন্য কতকগুলি সাধারণ ঘটনা। বঙ্কিম বাবু এতৎপূর্ব্বে ভাবপ্রধান এরূপ এক খানিও উপন্যাস লেখেন নাই। বিষবৃক্ষেও ভাব ছাড়া কতকগুলি কৌতূহল উদ্দীপনকারী সুতরাং মনোহর ঘটনার সন্নিবেশ আছে। ইহার পরেও এখন পর্য্যন্ত এ রকমের উপন্যাস বাহির হয় নাই 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' ঘটনাগুলি অতি সাধারণ—তাহা সচরাচর ঘটিতে দেখা যায়।

'কৃষ্ণকান্তের উইলের' আর একটি প্রধান প্রশংসা এই যে, বর্ত্তমান সমাজের ইহা সম্পূর্ণ উপযোগী—উপযোগী ও উপকারী। যাঁহারা স্থূল বিষয় লইয়া নভেল লিখিতে বসেন, বঙ্কিম বাবু আমাদিগের সেই শ্রেণীভুক্ত নহেন। যে সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব অতি সঙ্গোপনে আমাদিগের হৃদয় মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগের জীবনকার্য্য নিয়মিত করে, বঙ্কিম বাবু তাহাই বিকশিত রূপে পাঠকবর্গকে দেখাইয়া থাকেন।

'কৃষ্ণকান্তের উইলের', গোবিন্দলাল ও ভ্রমরে যে এখনকার কত যুবক-যুবতীর অন্তর-রহস্য সমালোচিত হইয়াছে, যুক্তির সহিত তাহা বিকল দেখাইয়া তাহার দোষগুলি কিরূপ সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে, তাহা 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' পাঠকবর্গের নিকটে অবিদিত নাই। গোবিন্দলালের অধঃপতনের সেই অঙ্কুরটুকু, আমাদিগের প্রায় প্রত্যেকের হৃদয়েই অবস্থিত রহিয়াছে—এমন চরিত্রের দোষগুলাও সমাজ-মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদিগের বোধ হয়, যদি আমরা ভাল করিয়া এই দুইটি চরিত্র বুঝিয়া হৃদয়স্থ করিয়া রাখিতে পারি—না বুঝিয়া ঘটনার সন্তাড়নে আমাদিগকে কখনই ঐ প্রকার অধঃপতিত হইতে হইবে না। অনেক সময়ে আমরা একটি ভাবকে অন্ধভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শেষে এরূপ অবস্থায় আসিয়া পড়ি যে, তখন আর সে দোষ সংশোধনের উপায় থাকে না। আমরা তখন অবস্থার সম্যক দাস হইয়া, মানব মনের বিচার শক্তি জনিত উৎকৃষ্ট পথাবলম্বনের উপায় রহিত হইয়া পশুবৎ বিনষ্ট হইয়া থাকি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর গোবিন্দলাল সদেচ্ছা ও জ্ঞানযুক্ত হইয়াও অন্তর-বিশ্লেষণের ক্ষমতা না থাকা প্রযুক্ত ঐরূপে অধঃপতিত হইয়াছিলেন। গোবিন্দলাল এখন শত সহস্র যুবকের শিক্ষক হইতে পারেন।

বঙ্কিমচন্দ্র।

চন্দ্রশেখর।

ইতিবৃত্ত।

"চন্দ্রশেখর" প্রথমে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ১২৮১ সনে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার সময়ে ইহার অনেকাংশ পরিবর্ত্তিত, অনেকাংশ পরিত্যক্ত এবং কোন কোন স্থান পুনঃ লিখিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে বঙ্কিমবাবু চারি খানি নবেল লিখিয়াছিলেন।

১২৯০ সালে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। এখন পর্য্যন্ত ইহা তৃতীয়বার মুদ্রিত হয় নাই। সাধারণে পুস্তকখানির বেশ আদর আছে। বাঙ্গালার পাঠকমাত্রেই চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের কথা অবগত আছেন। অন্তের সহিত তুলনায় ইহারা আদর্শ-চিত্র মধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন।

ইহার ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিতে চাহি না। যে অর্থে Henry IV. প্রভৃতি গ্রন্থকে ঐতিহাসিক নাটক বলিয়া থাকে, সে অর্থে বঙ্কিমবাবুর প্রায় উপন্যাসই ঐতিহাসিক নহে। নচেৎ ঐতিহাসিক ঘটনা থাকিলেই তাহা ঐতিহাসিক উপন্যাস হয় না। ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "সয়ের মতাক্ষরীন্ নামক পারস্য গ্রন্থের একখানি ইংরেজি অনুবাদ আছে; ঐতিহাসিক বিষয়ে কোথাও কোথাও ঐ গ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ।"

পুস্তকখানির বর্ত্তমান মূল্য এক টাকা।

বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা। *

দুইটি বিভিন্ন পরিবার লইয়া "চন্দ্রশেখর" গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একটি নবাব মীরকাসেমের—অন্যটি দরিদ্র চন্দ্রশেখরের। আখ্যায়িকার নিয়মানুসারে এ গ্রন্থে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চন্দ্রশেখর নায়ক হইয়াও [illegible], নবাব মীরকাসেম কেবল তাঁহারই গৃহের শোভা সম্পাদন করিতেছেন। আমরা এই গ্রন্থে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাযোগ্য কেবল তিনটিই প্রধান চরিত্র দেখিতে পাই। (১) চন্দ্রশেখর (২) শৈবলিনী (৩) প্রতাপ।

১। চন্দ্রশেখর।

চন্দ্রশেখর বঙ্কিমবাবুর এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। হৃদয়ের মহান্ ভাব, চিত্তের ঔদার্য্য, প্রণয়ের প্রগাঢ়তা, এ চিত্রে অতি মনোহর রূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। মনুষ্যের সহিত সমানক্ষেত্রে রাখিয়া প্রতিভাসম্পন্ন ক্ষমতাশালী কবি যতদূর মহৎ ও উন্নত চরিত্র কল্পনা করিতে পারেন, চন্দ্রশেখরের চরিত্র ততদূরই উন্নত ও মহৎ হইয়াছে। আর একটু রঙ্ ফলাইতে গেলেই যেন ইহা আর একরূপ মনোহর হইতে পারিত না—যেন চিত্রটির স্বাভাবিকতা (Reality) সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যাইত, এবং আমরা ইহাকে অলৌকিক বলিয়া বোধ করিতে বাধ্য হইতাম। তবে কি চন্দ্রশেখর কাল্পনিক আদর্শ-চরিত্র নহে? অবশ্যই কাল্পনিক চরিত্র বটে কিন্তু কাল্পনিক চিত্রমধ্যেও আবার শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে, ইহার মধ্যেও আবার স্বাভাবিকতা ও কাল্পনিকতা আছে। এক শ্রেণীর চরিত্র দেখিলে, প্রথম দৃষ্টিতেই তাহা কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়, কাজেই সেইগুলি আমাদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সম্যক্ সমর্থ হয় না; আর এক শ্রেণীর চরিত্র কাল্পনিক হইলেও তাহা দেখিয়া স্বাভাবিক বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। আমাদিগের বিবেচনায় যিনি যে পরিমাণে এই শেষোক্ত প্রকারের চরিত্র সৃজন করিতে পারেন—যাঁহার কাল্পনিক চিত্রে যতদূর স্বাভাবিকতার চিহ্ন থাকে, তিনি সেই পরিমাণে প্রতিভাশালী ও চরিত্র সৃজনে ক্ষমতাপন্ন। স্বাভাবিক চরিত্র চিত্রণে যে একেবারেই নৈপুণ্য প্রকাশিত হইতে পারে না আমরা এ কথা বলিতেছি না, জীবনচরিত লিখিতে গিয়াও চিত্রনৈপুণ্য দেখান যাইতে পারে, কিন্তু সে চাতুর্য্য ও সে কৌশলে, আর আমরা যাহার কথা বলিলাম সে কৌশলে—প্রভেদ বিস্তর। একের প্রশংসা নির্ব্বাচনে—অন্যের প্রশংসা কল্পনায়। একের প্রশংসা প্রকৃতি রাজ্য হইতে মনোহর ও অভীষ্ট-ফলোৎপাদক চিত্রগুলি নির্ব্বাচন করিয়া, তাহাই অবিকৃতভাবে সাধারণ্যে উপস্থিত করায়; অন্যের প্রশংসা প্রকৃতিরাজ্য হইতে কতকগুলি সুন্দর ও উৎকৃষ্ট রঙ্ বাছিয়া লইয়া তদ্দ্বারা একটি অলৌকিক চিত্র অঙ্কিত করায়। তাঁহার চিত্রের রঙ্গুলি সকলই আমাদিগের পরিচিত, কিন্তু সে গুলির মিশ্রণ আমরা কোথাও দেখিতে

* চন্দ্রশেখর এ শৈবলিনী-চরিত্র ভিন্ন অন্য অঙ্কিত চরিত্রগুলি অধিক উজ্জ্বল—[illegible]। চন্দ্রশেখর প্রতাপ, দলনী, রমানন্দের [illegible] সংক্ষেপে আরও [illegible] যায়, সুতরাং তাহা [illegible] বিশেষ ব্যাখ্যা না করিয়া চলিতে পারে।

পাইনা এবং তাহা অতি উৎকৃষ্টরূপেও জগতে বিরাজ করে না। আমাদিগের বর্ণনীয় চন্দ্রশেখরও এই শ্রেণীর চরিত্র। চন্দ্রশেখরের চরিত্রে মানবীয় উদারতা, মহত্ত্ব ও ক্ষমাশীলতার পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবার দুই একটি মানবীয় দুর্ব্বলতা রাখিয়া দিয়া; কতকগুলি স্বাভাবিক রঙকে অতি সুন্দর করিয়া, মার্জ্জিত করিয়া, অপরোর কতকগুলি স্বাভাবিক রঙ অমার্জ্জিতাবস্থায় রাখিয়া দিয়া, কবিবর একটি স্বাভাবিক অথচ কাল্পনিক চিত্র আঁকিয়াছেন। চন্দ্রশেখর কাল্পনিক হইয়াও স্বাভাবিক। ইহাই কবির কৌশল, ইহাই শ্রেষ্ঠ কবির আশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচয়।

চন্দ্রশেখর আদর্শ-চরিত্র। কিন্তু আদর্শ চরিত্র কিছু এক রকমের থাকে না, অথবা সকল বিষয়ের আদর্শ এক ব্যক্তিতে দেখা যায় না। জ্ঞান, ভক্তি, ও কর্ম্ম এক ব্যক্তিতে সমান মাত্রায় দেখিতে পাওয়া দুষ্কর। চন্দ্রশেখর আমাদিগের এ দেশীয় কবির কল্পিত আদর্শ-চিত্র। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের ন্যায় তিনি সম্পূর্ণ সংসার বন্ধন বিমুক্তও নহেন, আবার সামান্য লোকের ন্যায় তিনি সংসার মায়াতেই সম্পূর্ণ নিবদ্ধ নহেন। তিনি এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চরমোৎকর্ষ। বঙ্কিম বাবু এই চিত্রটিকে কিরূপ করিয়া পরিচিত করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার পরিচয় দিতেছি। আধ্যাত্মিক উন্নতিপ্রিয় বাঙ্গালি কবির ‘চন্দ্রশেখর’ এইরূপই হওয়া উচিত।

চন্দ্রশেখর জ্ঞান-পিপাসু। গ্রন্থের প্রারম্ভেই কবি আমাদিগকে এ জ্ঞানতৃষ্ণা সুন্দররূপে দেখাইবার জন্য বলিয়া লইলেন,—

“তিনি গৃহস্থ অথচ সন্ন্যাসী নহেন। এ পর্য্যন্ত দারপরিগ্রহ করেন নাই। দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহ ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি বৎসরাধিক কাল গত হইল, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাহাতে দারপরিগ্রহ না করাই জ্ঞানার্জ্জনের বিঘ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ স্বহস্তে পাক করিতে হয়, তাহাতে অনেক সময় যায়। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিঘ্ন ঘটে। * * * চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, বিবাহ করিলে কোন কোন দিকে সুবিধা হইতে পারে।” চন্দ্রশেখর অবশেষে বিবাহ করিলেন। কিন্তু তাহা জ্ঞানতৃষ্ণা নির্ব্বিঘ্নে পরিতৃপ্ত হইবে বলিয়া।

চন্দ্রশেখর স্বীয় জীবনের একজন কঠোর সমালোচক। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, তিনি সর্ব্বদাই অধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ড ধরিয়া আছেন। তিনি শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া অনুতপ্ত। চন্দ্রশেখরকে আমরা একদিন ভাবিতে দেখিয়াছি—

“হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলন-ব্যস্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমি সর্ব্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত। আমি কি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া

পাড়িয়া, এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীমুখপদ্ম কি ইহজন্মের সারভূত করিব? ছি, ছি, তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধা শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?" আবার শৈবলিনী যখন উন্মত্তাবস্থায় যোগবলে চন্দ্রশেখরের নিকট কহিল, 'এক বোঁটায় দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক্‌ করিলে কেন?' "চন্দ্রশেখর অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অপরিসীম বুদ্ধিতে কিছু লুক্কায়িত রহিল না।"

চন্দ্রশেখর শান্তিপ্রিয়—তিনি ক্ষমাগুণের আধার; তাঁহার নিকট শত্রু মিত্র ভেদ নাই। প্রতিহিংসা তাঁহার নিকট নিকৃষ্ট ধর্ম। চতুর প্রতাপ যখন 'ফষ্টর এখনও জীবিত আছে, তাহার বধে চলিলাম" বলিয়া চন্দ্রশেখরকে যুদ্ধে গমনের একটি কারণ দেখাইয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, চন্দ্রশেখর বলিলেন,—

"ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট ভগবান্ তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা? যে অধম সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে, সে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে।

দেখিলে উদারতা! দেখিলে ক্ষমাগুণ! আমাদিগের কবির কল্পনাতেই এইরূপ চিত্র সৃষ্ট হইতে পারে। খৃষ্টিয়ান হইলেই হয় না, চিরকালের মনের ভাব দুই এক দিনের শিক্ষা বা দুই এক জনের দৃষ্টান্তে অপসারিত হয় না। আর্য্যদেশে খৃষ্টের অভাব নাই, আর্য্যদেশের শিক্ষা পূর্ব্বাবধিই অনুরূপ, তাই এরূপ ক্ষমাগুণের কথা কেবল সেই খানেই সম্ভব পর। রক্তপিপাসু, প্রতিহিংসাপরায়ণ কোন জাতির কবি এই স্থলটি কিরূপ করিয়া তুলিতেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

আরও একটি কথা এখানে না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। যে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য চন্দ্রশেখর প্রথমে দারপরিগ্রহ কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই এবং যে জ্ঞানার্জ্জনের জন্যই আবার তাঁহার দারপরিগ্রহণার্থ ইচ্ছা হইল, সে জ্ঞানের ফল এইরূপ। বোধ হয়, ইহা দেখিলে, উনবিংশ শতাব্দীর 'সুশিক্ষিত'—ইংরাজি-চালে-শিক্ষিত যুবকগণও চন্দ্রশেখরের জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিবাহ করার অপরাধটি মার্জ্জনা করিবেন।

তাঁহার চন্দ্রশেখর জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক। তিনি "কৃতজ্ঞ ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু।" জ্ঞান ও ভক্তি দুইই তাঁহাতে দেখিতে পাই। চন্দ্রশেখর গৃহ প্রত্যাগমনের সময় ভাবিতে লাগিলেন—

"কেন, বিদেশ হইতে আগমন কালে স্বগৃহ দেখিয়া হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হয় কেন? আমি কি এতদিন আহার নিদ্রার কষ্ট পাইয়াছি? গৃহে গেলে বিদেশ অপেক্ষা কি সুখে সুখী হইব? এ বয়সে আমাকে গুরুতর মোহবন্ধে

পড়িতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ঐ গৃহ-মধ্যে আমার প্রেয়সী ভার্য্যা বাস করেন, এইজন্য আমার এ আহ্লাদ? লোকে বলে সকলই মায়া। কিছুই মায়া নয়, তাহারাই মায়ায় মায়ায় মুগ্ধ। ভগবান বলিয়াছেন, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই আমি। যদি তাই, তবে কাহারও প্রতি প্রেমাধিক্য—কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে কেন? সকলেই ত সেই সচ্চিদানন্দ। আমার যে তরী লইয়া আসিতেছে, তাহার প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিতে ইচ্ছা হইতেছে না কেন? আর সেই উৎফুল্ল কমলাননার মুখপদ্ম দেখিবার জন্য এত কাতর হইয়াছি কেন? আমি ভগবদ্বাক্যে অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু আমি দারুণ মোহজালে জড়িত হইতেছি। এ মোহজাল কাটিতে ইচ্ছা করে না—যদি অনন্ত কাল বাঁচি, তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব।"

এই স্থানে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকে কঠোর সমালোচক রূপে স্বীয় অন্তর পর্য্যবেক্ষণ করিতে আমরা দেখিতে পাই। ভগবান্ বলিয়াছেন, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই আমি। যদি তাই, তবে তিনি (চন্দ্রশেখর) তাঁহার অন্যদার অপেক্ষা শৈবলিনীর কথা এত ভাবিতেছেন কেন? কথাটা তাঁহাকে কিছু গোলে ফেলিল। তাঁহার নিকট যেন বোধ হইল, যে, ইহা না করিয়া পারা যায় না। সর্ব্বভূতে সমানজ্ঞান কোন কাজের কথা নহে। তাড়াতাড়ি আবার চন্দ্রশেখর বলিয়া বসিলেন—"ভগবদ্বাক্যে আমি অশ্রদ্ধা করি না—কিন্তু আমি দারুণ মোহজালে জড়িত হইয়াছি।" ধন্য চন্দ্রশেখর! ধন্য আর্য্যদেশ! এইখানেই এই চরিত্র কল্পিত হইতে পারে। এত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে জীবনের কার্য্যগুলি আর কোথায় কে দেখিতে পারে? যতই আমাদিগের স্থূল বিষয়ের জন্য ভাবনা কমিয়া আইসে, ততই আমরা সূক্ষ্মবিষয়ের জন্য ভাবিতে অগ্রসর হই। লোকের অন্তঃকরণ যে পরিমাণে উন্নত হইবে, লোকের স্বভাব যে পরিমাণে মার্জ্জিত হইবে, এইরূপ সূক্ষ্ম বিষয়ে তাঁহার ততই দৃষ্টি পড়িবে। আমার নিকট একটি নরহত্যায় যে পাপ ও গ্লানি বোধ হইবে, অপেক্ষাকৃত উন্নতমনা একটি ধার্ম্মিক লোকের নিকট একটি কীট মাড়াইতেও সেইরূপ পাপ ও সেইরূপ গ্লানি বোধ হইবে। চন্দ্রশেখর যে কত বড় ধার্ম্মিক, চন্দ্রশেখর যে তাঁহার জীবনের কার্য্য কিরূপ তুলিতে মাপিয়া লয়েন, আত্মার প্রতি তাঁহার কিরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কবি এই উক্তিতেই স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

চন্দ্রশেখর পরোপকারী—তিনি আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও এক দিন প্রতাপের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুভক্তি অসীম—তিনি রমানন্দ স্বামীর সম্পূর্ণ উপযুক্ত শিষ্য। ইঁহার নিকটেই তিনি পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রশেখরের প্রণয় অপরিসীম। অন্তঃসলিলবাহিনী ফল্গু নদীর ন্যায় তাহা আপন মনেই বহিয়া যাইতেছিল; বাহিরে তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহাতে জোয়ার ভাটা ছিল না, ঈষৎ বায়ু বহিলেই সেখানে তরঙ্গ উঠিত না তাহা নির্বাত নিষ্কম্প প্রশান্ত সাগরের ন্যায়

স্নিগ্ধ গভীর ও মহান ভাবোদ্দীপক। যে দিন কবি আমাদিগকে বাহিরের বালুকারাশি বিচ্ছিন্ন করাইয়া তাঁহার সেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ নিরীক্ষণ করিতে দিলেন, সেই দিনই আমরা সে স্নেহরাশির অপরিমেয়তা ও প্রগাঢ়তা দেখিতে পাইলাম. কিন্তু যতক্ষণ না সে বালুকারাশি ঘটনাচক্রে স্থানচ্যুত হইল, ততক্ষণ তাহা প্রচ্ছন্ন, অতি প্রচ্ছন্নভাবে হৃদয়ের অন্তঃপ্রদেশে লুক্কায়িত ছিল, বুঝি তাহা চন্দ্রশেখরও প্রথমে সম্যক্ জানিয়া উঠিতে পারেন নাই। গ্রন্থকার চন্দ্রশেখরের এ ভাবটি যখন বাহিরে প্রকাশিত করিলেন, তখনও আমরা তাঁহার কৌশল দেখিয়া মোহিত হইলাম।

শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সুন্দরী তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিলেন, তিনি প্রত্যাগত হন নাই, চন্দ্রশেখর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সকল শুনিলেন। "তখন, চন্দ্রশেখর যত্নে গৃহপ্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম শিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। তৈজস, বস্ত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য দ্রব্যজাত দরিদ্র প্রতিবাসীদের ডাকিয়া বিতরণ করিলেন। সায়াহ্নকাল পর্য্যন্ত এই সকল কার্য্য করিলেন। সায়াহ্নকালে আপনার অধীত, অধ্যয়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয়, গ্রন্থগুলি একে একে আনিয়া একত্রিত করিলেন। একে একে প্রাঙ্গণ মধ্যে সাজাইলেন—সাজাইতে সাজাইতে এক একবার কোন খানি খুলিলেন—আবার না পড়িয়াই তাহা বাঁধিলেন—সকলগুলি প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া সাজাইলেন। সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন।

"অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ক্রমে ক্রমে সকলই ধরিয়া উঠিল; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতি; ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য, প্রভৃতি দর্শন; কল্পসূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ্ একে একে সকলই অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিতে লাগিল। বহু যত্নে সংগৃহীত, বহু কাল হইতে অধীত, সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।

"রাত্রি এক প্রহরে গ্রন্থদাহ সমাপন করিয়া চন্দ্রশেখর উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না—কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।"

আমরা ইহা পড়িয়াই দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলাম, চন্দ্রশেখরের হৃদয়ে কি আছে। এইখানেই আমরা কবির সেই দুই এক কথায় চন্দ্রশেখরের অপূর্ব্ব প্রণয় বর্ণনার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম। সেই ভালবাসা "সমুদ্রতুল্য—অপার, অপরিমেয় অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল—প্রশান্তভাবে স্থির, গম্ভীর, মাধুর্য্যময়—চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী, তরঙ্গভঙ্গভীষণ, অগম্য, অজেয়, ভয়ঙ্কর" যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলাম। ইহা দ্বারা চন্দ্রশেখরের প্রগাঢ় প্রণয় যেরূপ দেখান হইয়াছে, শত পাতা লিখিয়া মরিলেও সেরূপ হইত না। শিল্পীর এই ত এক প্রধান গুণ। ঘটনাতেই, কার্য্যেতেই তাঁহার চিত্রিত চরিত্রের বিকাশ হয়। সেই পুঁথি পোড়ান সেই শালগ্রাম-শিলা বিসর্জন, সেরূপ

করিয়া গৃহত্যাগী হওয়া, ইহাতে চন্দ্রশেখরের হৃদয়খানি বড়ই খুলিয়াছে। এইখানেই তাঁহাকে মানুষ বলিয়া বোধ হয় এবং এইখানেই তাঁহার দেবভাব, মহত্ব ও প্রণয়ের প্রগাঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, এবং সুন্দরীর ন্যায় শৈবলিনীকে একবার বলিতে ইচ্ছা হয়—

"জানি যে পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠা আছে, তোমার মত পাপিষ্ঠা আর কেহ নাই। যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্লভ, তাঁহার স্নেহে তোমার মন উঠে না। কিনা, বালকে যেমন খেলাঘরের পুতুলকে আদর করে, তিনি স্ত্রীকে সেরূপ আদর করিতে জানেন না। কিনা, বিধাতা তাঁকে সং গড়িয়া রাংতা দিয়া সাজান নাই—মানুষ গড়িয়াছেন। তিনি ধর্ম্মাত্মা, পণ্ডিত, তুমি পাপিষ্ঠা; তাঁহাকে তোমার মনে ধরিবে কেন? তুমি অন্ধের অধিক অন্ধ, তাই বুঝিতে পার না যে, তোমার স্বামী তোমায় যেরূপ ভাল বাসেন, নারীজন্মে সেরূপ ভালবাসা দুর্লভ—অনেক পুণ্যফলে এমন স্বামীর কাছে তুমি এমন ভালবাসা পেয়েছিলে।"

চন্দ্রশেখরের এই প্রণয় যে কিরূপে শৈবলিনী-বিচ্ছেদের পরে জগৎ ব্যাপিয়া ধরিয়াছিল, তাহা পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ তাহা শুদ্ধ চন্দ্রশেখরের স্বভাবসিদ্ধ পরহিতব্রতের প্রবর্ত্তক মাত্র, তাহার উৎপত্তি-কারণ নহে। তবে এই প্রণয় সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলিবার আছে, সেটি এই। এ প্রণয় যতই কেন প্রগাঢ় বা প্রবল থাকুক না, ধর্ম্মবীর চন্দ্রশেখরকে তিলটুকুও স্বধর্ম্মচ্যুত করিতে পারিল না। প্রণয়ের প্রাবল্য আমরা শৈবলিনী-তেও দেখিয়াছি, তাহা শৈবলিনীকে মোহময়ী করিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু চন্দ্রশেখরের প্রণয় প্রবল হইলেও তাঁহার প্রবলতর কর্ত্তব্যজ্ঞান ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। চন্দ্রশেখরের ধর্ম্মে যে কতদূর বিশ্বাস ছিল, তাহাও ইহাতে বেশ প্রকাশ পাইয়াছে। চন্দ্রশেখর অত্যন্ত হিন্দু—শৈবলিনী তাঁহার গৃহ হইতে যে কারণেই হউক কষ্টরের সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছিল—শৈবলিনী তাঁহার প্রাণের সারভূত হইলেও, তিনি তাহাকে হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন গ্রহণ করিতে পারিলেন না। আবার তাহার কার্য্যতঃ সতীত্ব সম্বন্ধে ও ম্লেচ্ছান্ন-ভোজন প্রভৃতি সম্বন্ধে সন্দেহ যখন দূরীকৃত হইল, তখন তিনি তাহাকে গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। শৈবলিনীর ধর্ম্মতঃ প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে চন্দ্রশেখরের উদার মনে শৈবলিনী অনায়াসে স্থান লাভ করিল। তখন আবার তিনি তুচ্ছ সমাজের দিকে চাহিলেন না। যখন শৈবলিনী বলিল "আপনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী। বলুন আমি জাতিভ্রষ্টা কি না। আমি তাহার অন্ন খাই নাই—তাহার স্পৃষ্ট জলও পান করি নাই। প্রত্যহ স্বহস্তে পাক করিয়া খাইয়াছি। হিন্দু পরিচারিকায় আয়োজন করিয়া দিয়াছে। এক নৌকায় বাস করিয়াছি বটে—কিন্তু গঙ্গার উপর।" চন্দ্রশেখর অধোবদন হইয়া বসিলেন,—অনেক ভাবিলেন—বলিতে লাগিলেন, 'হায়! হায়! কি কুকর্ম্ম করিয়াছি—স্ত্রীহত্যা করিতে বসিয়াছিলাম!" বল দেখি ভাই, এ চন্দ্রশেখরের বিরাট মূর্ত্তি আমরা কিরূপে আঁকিব? ক্ষুদ্র মানব আমরা, আধ্যাত্মিক বীর চন্দ্রশেখরকে দূর

হইতে দেখিয়াই বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে।

২। শৈবলিনী।

কোন একটি কাব্যচিত্রিত চরিত্র পরীক্ষা করিতে হইলে আমাদিগের প্রথমে দেখিতে হইবে, ইহার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিতে সামঞ্জস্য আছে কি না? যদি তাহা না থাকে, তবে অস্বাভাবিক বলিয়া আমরা সে চিত্র উপেক্ষা করিতে পারি। কারণ যাহা জগতে নাই, হইতেও পারে না, সে চিত্রে প্রশংসার যোগ্য কিছু আছে আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। এ স্থলে তর্ক উঠিতে পারে যে, যাহা জগতে নাই, তাহা কল্পিত হইল কিরূপে? ইহার মীমাংসা অতি সহজ। অংশ সম্বন্ধেই, অথবা মৌলিক অঙ্গ সম্বন্ধেই এই কথা সঙ্গত—অংশের সমাবেশে ইহা সঙ্গত হইতে পারে না। এই কথাটি বুঝিলে, আমরা এই অংশগুলির সামঞ্জস্যেই কেবল স্বাভাবিকতা কেন দেখি, তাহা বুঝা যাইবে। বরং যে সকল চিত্রের অংশগুলির সামঞ্জস্য বেশ্ আছে, অথচ যাহা জগতে দেখা যায় না, সেই সকল চিত্রেরই অথবা সেই সকল চিত্রের চিত্রকরগণেরই প্রশংসা অধিক।

তার পরে দেখিতে হইবে গ্রন্থের উদ্দেশ্য। প্রথমে দেখিলাম, শিল্পচাতুর্য্য উদ্দেশ্য না থাকিলেও কেবল ইহাতেই প্রশংসার কথা আছে। তার পরে, দেখিব, কারিকরের সুশিক্ষা ও সুরুচি। এই দুইটি বিষয়—চিত্রের স্বাভাবিকতা ও সদুদ্দেশ্য—যে পরিমাণে যাহাতে দেখিব, সেই পরিমাণে তাহাকে প্রশংসা করিব।

আমরা শৈবলিনীর চিত্রে দুইটিই অতি সুন্দর দেখিলাম। এই জন্যই আমরা বলিতে সাহসী যে, শৈবলিনী একটি পূর্ণ চরিত্র। কেবল মহত্ত্ব অঙ্কিত করাতেই যে প্রশংসা আছে এমত নহে, পাপ দেখাইতেও প্রশংসা আছে। শৈবলিনীর পাপচরিত্র কাব্যগ্রন্থের অতি উজ্জ্বল রত্ন।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহা এখন স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছি।

শৈবলিনী-জীবন বিশ্লেষণ করিলে, এই কয়েকটি প্রধান ভাব ও ঘটনা পরিলক্ষিত হইবে—(ক) প্রসক্তি (খ) পাপ (গ) অনুতাপ (ঘ) প্রায়শ্চিত্ত ও শাস্তি (ঙ) সিদ্ধি বা পরিণাম।

শৈবলিনীর প্রসক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে প্রতাপকে অবলম্বন করিয়াই তাহা বলিতে হইবে। ইহাই তাহার জীবনের প্রধান ভাব, অন্যান্য ঘটনা ইহারই পরিণাম মাত্র। শৈবলিনীর এই 'প্রসক্তি' বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিবার সময় আমরা অন্য অধ্যায়ের কথা পাড়িব না—তজ্জন্য আমরা 'পাপ' নামক আর একটি পৃথক অধ্যায় স্থির করিয়া রাখিয়াছি।

প্রসক্তির প্রকৃতি দেখাইতে কিরূপে তাহার উৎপত্তি হইল, এ কথাটি বড়ই প্রয়োজনীয়। সে প্রণয় রূপজ না সংসর্গজ তাহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে পারিলেই আমরা সে প্রসক্তির প্রকৃতি ও পরিণাম অনেকটা বুঝিতে পারি। এই জন্য প্রসক্তি দেখাইতে, তাহার উৎপত্তি, বিকাশ, পরিণাম এই তিনটিই আমাদিগের দেখিতে হইবে।

প্রথমে শৈবলিনীর প্রতাপাসক্তির উৎপত্তি দেখা যাউক। গ্রন্থকার ইহা

সুস্পষ্ট দেখাইবার জন্য মূল গ্রন্থ ছাড়া আর একটি খণ্ড রচনার আবশ্যকতা বোধ করিয়াছেন। শৈবলিনীর প্রণয়ের প্রারম্ভ "চন্দ্রশেখরের" উপক্রমণিকায়। এইখানেই গ্রন্থকার শৈবলিনী ও প্রতাপকে আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে একত্র করিয়া ধরিয়াছেন। শৈবলিনী তখন ৭।৮ বৎসরের বালিকা—প্রতাপ কিশোরবয়স্ক। একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, এই স্থলটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাই, বঙ্কিম বাবু গ্রন্থখানি কেমন সুন্দর আরম্ভ করিয়াছেন। এইখানে শৈবলিনীর বালিকা-চরিত্র বড়ই সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। এই আকাশের তারা গণায়, ভাগিরথী স্রোতে বহমান নৌকা গণায়, সেই নৌকার দাঁড়ের জলে সোণা জ্বলিতে দেখায় বালক-বালিকার কোমল ও উৎসুক হৃদয়টি অতি কোমল ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

বালক-বালিকারা যেরূপ খেলিয়া থাকে শৈবলিনী ও প্রতাপ ঠিক সেইরূপই খেলা করিত, আর বালক বালিকার একরূপ ঘনিষ্ঠতায় যে ফল ফলিয়া থাকে, এখানেও তাহাই ফলিল। গ্রন্থকার লিখিলেন "এইরূপে ভালবাসা জন্মিল। প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয় না বল। ষোল বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা। বালকের ন্যায় কেহ ভাল বাসিতে জানে না।" শৈবলিনীর বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, এ ভালবাসা ততই পরিবর্দ্ধিত হইতে চলিল। পরে জ্ঞান হইলে শৈবলিনী বুঝিল যে "প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই।"

গ্রন্থকার এইরূপ করিয়া ধীরে ধীরে দুই এক কথায় প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর ভালবাসার উৎপত্তি দেখাইলেন, তাহার কারণও বলিলেন।

এই প্রসক্তির প্রথম বিকাশ আমাদিগকে গ্রন্থকার এইরূপে দেখাইয়াছেন। যখন শৈবলিনী ও প্রতাপ উভয়েই বুঝিতে পারিল যে, এ জন্মে তাহাদিগের মিলন হইবার সম্ভাবনা নাই, "দুই জনে পরামর্শ করিতে লাগিল। অনেক দিন ধরিয়া পরামর্শ করিল। গোপনে গোপনে পরামর্শ করে, কেহ জানিতে পারে না। পরামর্শ ঠিক হইলে, দুই জনে গঙ্গাস্নানে গেল। গঙ্গায় অনেকে সাঁতার দিতেছিল। প্রতাপ বলিল, আয় শৈবলিনি! সাঁতার দিই। দুই জনে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। সন্তরণে দুই জনেই পটু—তেমন সাঁতার দিতে গ্রামের কোন ছেলে পারিত না। বর্ষাকাল—কূলে কূলে গঙ্গার জল—জল দুলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। দুই জনে সেই জলরাশি ভিন্ন করিয়া, মথিত করিয়া, উৎক্ষিপ্ত করিয়া, সাঁতার দিয়া চলিল; ফেণ-চক্র মধ্যে সুন্দর নবীন বপুর্দ্বয়, রজতাঙ্গুরীয় মধ্যে রত্নযুগলের ন্যায় শোভিতে লাগিল। সাঁতার দিতে দিতে ইহারা অনেক দূর গেল দেখিয়া ঘাটে যাহারা ছিল, তাহারা ডাকিয়া ডাকিয়া ফিরিতে বলিল। বালক বালিকা শুনিল না—চলিল। আবার সকলে ডাকিল—তিরস্কার করিল—গালি দিল—দুই জনের কেহ শুনিল না—চলিল অনেক দূরে গিয়া প্রতাপ বলিল, "শৈবলিনী এই আমাদের বিয়ে!" শৈবলিনী বলিল 'আর কেন—এই খানেই!' প্রতাপ ডুবিল। শৈবলিনী ডুবিল না। সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল। মনে ভাবিল—কেন

মরিব? প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে, আমি মরিতে পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না—ফিরিল। সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।”

এই ঘটনায় প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রণয়ের দ্বিতীয় স্তর দেখান হইয়াছে। এখন হইতেই আবার তাহাদিগের প্রণয়ের সাধারণ ভাবটুকু পৃথক্ হইয়া পড়িবে। শৈবলিনী এখানে ডুবিতে পারিল না—তাহার ভয় করে। শৈবলিনীর স্ত্রীচরিত্র প্রতাপের পুংশ্চরিত্রের কাছে থাকিয়া তাঁহারই শোভা বৰ্দ্ধন করিল। শৈবলিনীর প্রণয় প্রতাপ-প্রণয়ের ন্যায় এখনও বিকশিত হয় নাই, তাই শৈবলিনী এখনও ভাবিতে পারিতেছে ‘কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে?’ উভয়েরই পরিণামের কথা ভাবিয়া দেখিলে, এই ঘটনাটী বড়ই কৌশলে বর্ণিত হইয়াছে বোধ হইবে। আরও একটি কথা এখানে বলিতে হইবে শেষে শৈবলিনীর আমরা যে সাহস দেখিতে পাইয়াছি, তাহা এখানে দেখিতে পাইলাম না। কিছু দেখিতে পাইলাম—ঐ রকম একটা উদ্যোগেও সাহসের কম পরিচয় নহে;—তবে, নিরাশায় যে প্রবল সাহস, তাহা এক্ষণে শৈবলিনীতে দেখিতে পাইলাম না। তাহার কারণ এখনও সম্যক ঘটে নাই।

শৈবলিনী আর প্রতাপকে মুখ দেখাইল না। বোধ হয়, আর একদিন আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ততর করিয়া মুখ দেখাইবে ভাবিতেছিল।

শেষে শৈবলিনীর সঙ্গে চন্দ্রশেখরের বিবাহ হইল। এই বিবাহের আটবৎসর পরে এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল। এতকাল শৈবলিনী, চন্দ্রশেখরের ঘর করিলে পর, গ্রন্থকার এই আখ্যায়িকা আরম্ভ করিলেন। কারণ পরে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছি।

চন্দ্রশেখর কিরূপ প্রকৃতির লোক তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। শৈবলিনী ও প্রতাপসম্বন্ধীয় কথাও পাঠকবর্গ অবগত হইলেন। এখন তাঁহারা অতি সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন, চন্দ্রশেখরের সহবাসে শৈবলিনীর মন প্রতাপ সম্বন্ধে কিরূপ ভাবাপন্ন হইতে পারে। শৈবলিনী অশিক্ষিতা—কিন্তু অশিক্ষিতা বলিয়া কাহারও হৃদয় প্রণয়-শূন্য থাকে না। এ প্রণয় তাহার পাত্র অন্বেষণ করিয়া লইবেই। চন্দ্রশেখর দ্বারা শৈবলিনীর অশিক্ষিত হৃদয় তৃপ্ত হইল না। ইহার কারণ আমরা দুই খানি ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। কবিপ্রবর টেনিসন গুইনিবরের মুখে তাহার স্বামিপ্রতি অনাসক্তির কারণ এইরূপে বলিলেন,

'Arthur my lord, Arthur the faultless king'
The passionless perfection, my good lord---
But who can gaze upon the sun in heaven ?
* * * *
* * * but, friend, to me
He is all fault who hath no fault at all :
For who loves me must have a touch of earth ;
The low sun makes the colour: &c.--

আকারে, পণ্ডিতপ্রবর টেইন মিল্টনের জীবন-চরিত সমালোচনায় লিখিয়াছেন,

Nothing displeases women more than an austere and self contained character. They see that they have no hold upon it; its dignity awes them, its pride repels, its pre-occupations keep them aloof: they feel themselves of less value, neglected for general interests or speculative curiosities, judged, more [illegible], and that after an inflexible rule, at most regarded with condescension, as a sort of less reasonable and inferior being, shut out from the equality which they look for, and the love which alone can recompense to them the loss of equality.

ইহাই প্রথমটি [illegible] কবির [illegible] নীতিবাক্যের [illegible]। যাহা হউক, ইহার মধ্যে [illegible] এদেশে [illegible] পরিবারে সত্য। শৈবলিনীর পক্ষে তাহাই ঘটিল। শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখরে অনুরক্ত না হইতে [illegible] প্রতাপ থাকিতে তুলনায় [illegible] হইল। শৈবলিনীর হৃদয়ে [illegible] শৈবলিনীর প্রতাপ-প্রণয়-[illegible] পড়িল। এইখানে আমরা সেই অধ্যায়ে তৃতীয় স্তর দেখিতে পাইলাম।

[illegible] কোন [illegible] রক্ষা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে অন্য একটি বল প্রয়োগ আবশ্যক, প্রথম বল [illegible] হইতে রক্ষিতে কায় বল প্রয়োগ আবশ্যক [illegible] প্রতিরোধী অবস্থার সংঘর্ষণেই এই বল আমরা স্ফুটতর দেখিতে পাই। শৈবলিনীর প্রতাপ-মিলন পথে অনতিক্রমণীয় অনেকগুলি বাধা ছিল। স্বয়ং প্রতাপই তাহার একটি প্রকাণ্ড বিঘ্ন। তাই শৈবলিনীর প্রণয় [illegible]। বিবাহ হইবে না, অবস্থা প্রতিকূল, তাহাতেই শৈবলিনী [illegible] ডুবিয়া মরিতে সাধ হইয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহার প্রণয় পূর্ণতা লাভ করে নাই, তাই সে প্রতাপের সঙ্গে ডুবিতে পারিল না। এখন শৈবলিনীর বিবাহ হইল, শৈবলিনী সংসারী হইল, প্রতাপ প্রণয়-বিরোধী অবস্থাগুলি সব অনুকূল হইল, কিন্তু তবু শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিতে পারিল না। প্রতাপ আসিয়া তাহার সেই অঙ্কুরটি [illegible] শৈবলিনীর প্রণয়ে [illegible]। এইখানেই আমরা এ প্রণয়ের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইলাম।

যখন আমরা শৈবলিনীকে [illegible] মধ্যে [illegible] শৈবলিনী দেখিতে পাইলাম, তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে শৈবলিনী এখন [illegible] উন্মত্ত—শৈবলিনীর হৃদয় এখন [illegible]। যখন আমরা শৈবলিনীকে নির্ব্বিবাদে [illegible] সহিত গমন করিতে দেখিলাম, [illegible] সহিত তাহার [illegible], তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম, শৈবলিনী কেমন এক উচ্ছৃঙ্খলা হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মনে সুখ শান্তি নাই, তাহার আবার ভবিষ্যৎই কিসের?

তাহার অন্তর আকুল। কিসের? শৈবলিনী একস্থলে বলিয়াছে, "পৃথিবীতে আমার ভয় নাই। মৃত্যুর অপেক্ষা [illegible] এবং যাহার মৃত্যুর কামনা করে, তাহার কিসের ভয়?" লজ্জা, ভয়, অভিমান, যাহাই বল, সবই [illegible] যাহার জীবনলতা ছিন্ন, তাহার ইহাতে ভয় কি? অনেকে শৈবলিনীর চিত্র অস্বাভাবিকতা দেখিয়া দোষারোপ করিয়া থাকেন। বঙ্কিম [illegible] হউক, বা [illegible] কারণেই হউক, আমরা ইহাতে এত দোষ দেখিতে পাই না। কিন্তু শৈবলিনীর চরিত্র যে ঠিক স্বাভাবিক [illegible] হয় নাই, একথা সম্পূর্ণ আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। তবে একটি কথা আছে। শৈবলিনীই বল, আর চন্দ্রশেখরই বল, ঠিক মনুষ্য-চিত্র কবির অভিপ্রায় নহে, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই মানব-চিত্র কয়েকটি অবলম্বন করিয়া ভাব-রাজ্যের কতকগুলি চিত্র বিকশিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কবি এরূপ করিয়া শৈবলিনীকে চিত্রিত করিয়া শৈবলিনীর মোহ বা উন্মত্ততা, তাহার বর্ণনা-রাশি, সেরূপ [illegible] পারিতেন, এরূপ আর কিসে হইত? হৃদয়ে যখন একটি ভাব প্রবল হইয়া উঠে, তখন আমরা অন্য সব বিস্মৃত হইয়া কেবল তাহাই দেখিতে পাই। তাই আমরা শৈবলিনীকে প্রতাপ-চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রী-জাতি-সুলভ [illegible] পরিত্যাগ করিতে দেখিয়াছি। এটি ইংরাজি শিক্ষার কুফল বলিয়া কাহারও চিন্তিত হইতে হইবে না; তবে সকলে ঠিক থাকিলে, বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ যে ভয়ানক না হইলেও [illegible] হইতে পারে।

শৈবলিনীর এই প্রণয়ের বিকাশ আমরা কয়েকটি স্থানে অতি সুন্দর রূপেই দেখিতে পাইয়াছি। ফষ্টরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়া যে দিন প্রতাপ শৈবলিনীকে নিজ গৃহে দেখা দিলেন; যে দিন প্রতাপ-উদ্ধারের জন্য শৈবলিনী [illegible] সাহসিনী হইয়া নবাবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল; যে দিন ভাগীরথী-বক্ষে প্রতাপকে বাঁচাইবার জন্য শৈবলিনী প্রতাপের নিকট সেই নিদারুণ শপথ করিল; সেই দিন আমরা শৈবলিনীর প্রতাপ-প্রণয়ের বল পরিমাণ করিতে পাইলাম।

এখন শৈবলিনীর প্রতাপ-প্রণয়ের পরিণাম পরীক্ষা হইবে। যখন শৈবলিনী সম্পূর্ণ পরিবর্তিতা, যখন [illegible] শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল, তখনও শৈবলিনী প্রতাপ সহিত পুনঃ সাক্ষাতে বলিল "তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই—যত দিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কত দিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।"

এইস্থলে আমরা শৈবলিনীর প্রতাপ-প্রণয়ের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণাম পর্য্যালোচনা করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, শৈবলিনীর এ প্রণয়—প্রগাঢ়, স্থায়ী, ও অপ্রমেয়।

শৈবলিনীর চরিত্রে মনুষ্য জীবনের একটি অতি কঠিন সমস্যা ব্যাখ্যাত হই-

য়াছে। শৈবলিনীর শাস্তি সেই কঠিন সমুদ্র। এই পাপ দুস্তর, পুণ্য বলিতে পারা যায়, কবির প্রথমে তাহাই করিয়াছেন। পাপ দণ্ড করা অর্থ পাপের কতকগুলি কারণ (Extenuating circumstances) দেখান ও পাপের কঠোরতা হ্রাস করা। শৈবলিনীর অধিক বয়সে তাহার মনের অস্থিরতাতে বিবাহ, তাহার প্রতাপাসক্তির অপ্রমেয়ত্ব, তাহার স্বামি-ভক্তি এবং তাঁহার মহত্ত্বে বিশ্বাস, এই গুলি সেই Extenuating circumstances এতদ্ভিন্ন আরও একটি আছে। সেটি প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর বাল্যাবধি একত্র ক্রীড়া, সহবাস ইত্যাদি। শৈবলিনী মনে জানিত, প্রতাপের সঙ্গেই তাহার বিবাহ হইবে, সুতরাং প্রতাপকে ভালবাসিতে প্রথমে তাহার কোন পাপ বোধ হয় নাই। আবার শৈবলিনীর পাপের প্রকৃতিও কিছু অন্যরূপ। সে মনে মনেই অসতী—কার্য্যগত তাহার কোন পাপ ছিল না। এই মানসিক পাপটিকে যতদূর সূক্ষ্ম করা সম্ভব, কবিবর এইরূপে তাহাই করিয়া সেই সূক্ষ্ম পাপেরও পরিণাম দেখাইয়াছেন।

সকল বিষয়েরই প্রায় একটা সময় স্থির আছে। অনুতাপেরও তাহাই। যাহারা পাপকার্য্য অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের সকলেরই যে কাল সময়ে অনুতাপ হইবে, এরূপ ভরসা করা যায় না। প্রায়ই আমরা দেখিতে পাই, যে, পাপিকাদো যখন পাপাকাঙ্ক্ষা সম্যক পরিতৃপ্ত না হয়, যখন সেই পাপকার্য্য অভীষ্ট মতো সাধন না হয়, অথবা যখন তাহার অনুষ্ঠানে বিশেষ কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, যেমন পাপীর আর পাপবুদ্ধি লজ্জিত [illegible] অনুতপ্ত হইয়া থাকে।

শৈবলিনী চরিত্র বিশ্লেষণ করিলেও আমরা ঠিক ইহাই দেখিতে পাইব। শৈবলিনীর স্বেচ্ছাচার প্রতাপ করা—প্রতাপের জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি [illegible] হয় না। প্রতাপ-প্রাপ্তি-পথে সে [illegible] বিঘ্নের বিঘ্ন জ্ঞান করে নাই;—প্রতাপ [illegible] হইবার জন্য [illegible] সমস্ত, [illegible] প্রভৃতি সকলই পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে। [illegible] [illegible] বিঘ্ন উপস্থিত হইলে [illegible] শৈবলিনী [illegible] [illegible] প্রতাপের নিকট আসিল, [illegible] তাহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবার নহে, যখন এইরূপ একটি অনতিক্রমণীয় বাধা আসিয়া তাহার সম্মুখে পড়িল, তখন আর তাহার পূর্বের আত্মবিস্মৃতি থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

"শৈবলিনী আপনার কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল। যেখানে প্রাচীর পার্শ্বে শৈবলিনী স্বহস্তে করবীর বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল,—সেই করবীর সুকোমল শাখা প্রাচীর অতিক্রম করিয়া রক্তপুষ্প ধারণ করিয়া নীলাকাশকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া দুলিত, তখন তাহাতে ভ্রমর বা ক্ষুদ্র পক্ষী আসিয়া বসিত, তাহা মনে পড়িল। * * * শৈবলিনী আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিতে লাগিল, * * * অনর্থক কলঙ্ক কিনিলাম। জাতি হারাইলাম, পরকাল নষ্ট করিলাম।" শৈবলিনী কাঁদিতে লাগিল। এক মুহূর্ত

বাঁচিয়া থাকিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। আত্মহত্যার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। শৈবলিনী ভাবিল পবিত্র বেদগ্রামে গিয়া মরিব। স্বর্গদ্বারে যাইব, এখন আমার গতি নাই, কূল নাই, কিন্তু এখন প্রাণে আমি পাপিষ্ঠা নহি। তার পর মরিব।—আর উনি—যিনি আমার স্বামী—তাঁহাকে কি বলিয়া মরিব? কথাও মনে করিতে পারি না। মনে করিলে বোধ হয়, আমাকে শত সহস্র বৃশ্চিকে দংশন করে—সর্ব্বশরীর শিরায় আগুন জ্বলে। আমি তাঁহার যোগ্য নহি বলিয়া, আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তাতে কি তাঁর কোন ক্লেশ হইয়াছে? তিনি কি দুঃখ করিয়াছেন? না—আমি তাঁহার কেহ নাই। পুঁথিই তাঁহার সব। তিনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না। একবার নিতান্ত সাধ হয়, সেই কথাটি কেহ আসিয়া বলে—তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন। তাঁহাকে আমি কখন ভালবাসি নাই, কখন ভালবাসিতে পারিব না—তথাপি তাঁহার মনে যদি কোন ক্লেশ দিয়া থাকি, তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারি হইল। আর একটি কথা তাঁহাকে বলিতে সাধ করে,—কিন্তু [illegible] ঘটিয়া গিয়াছে, সে কথার আর সাক্ষী কে? আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?" শৈবলিনীর অনুতাপের প্রথম অধ্যায় এইরূপে আরম্ভ হইল। আশাপথে বিঘ্ন ঘটিল, বাঁধিল। শৈবলিনীর এই বোধটুকু হইল। কিন্তু এখনও শৈবলিনীকে আমরা খ্রীষ্টিয়ানদের ন্যায় সম্যক্ অনুতপ্তা দেখিতে পাই না। এখন অনুতাপের সহিত তাহার মিশিতেছে মধুর স্মৃতি, সব নাই। তাই যখন আমরা দেখিলাম প্রতাপকে এ জগৎ আশাতীত তাহাকে বিদায় দিতে হইল, তখন আমরা শৈবলিনীকে আত্মবোধসম্পন্না দেখিতে পাইলাম। তখন হইতে শৈবলিনী মনকে দমন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—তখন হইতে পাপেচ্ছা তাহাকে ছাড়িয়া চলিল। যে ভয়ে গুইনিভিয়ার ল্যান্সেলটের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল; ঠিক সেই কারণেই শৈবলিনী প্রতাপের নিকট হইতে পলায়ন করিল। যে ভয়ে দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যের জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। প্রাণভয়ে শৈবলিনী, সুখ সৌন্দর্য্য প্রণয়রাশি পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল। সুখ, সৌন্দর্য্য, প্রণয়, প্রতাপ, এ সকলে শৈবলিনীর আর অধিকার নাই—আশা নাই—আকাঙ্ক্ষা ও পরিহার্য্য—নিশ্চিন্ত থাকিলে, কে আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পারে? মরুভূমে থাকিলে, কোন তৃষিত পথিক, সুশীতল স্বচ্ছ সুবাসিত বারি দেখিয়া পান না করিয়া থাকিতে পারে?

শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের কার্য্য প্রায়ই এক—তবে আপনা হইতে বা দৈব হইতে আগত কষ্টকে আমরা শাস্তি বলি, ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গৃহীত কষ্টকে আমরা প্রায়শ্চিত্ত বলি। প্রায়শ্চিত্তকে এক প্রকার চিকিৎসা বলা যাইতে পারে। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তকে এক প্রকার তাহার বিকৃত মনোভাবের চিকিৎসা বলা যায়। শৈবলিনীর আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্ত, সুতরাং তাহার মনোভাব সম্বন্ধে বিকৃত ভাবাপন্ন। আমাদের বঙ্গীয় কবির চিকিৎসা-

প্রকৃত দোষে আমরা লজ্জিত হইয়াছি—শত সহস্রবার প্রণাম করিয়া তাঁহাকে ভক্তি উপহার দিয়াছি। চন্দ্রশেখরের "ও স্বামিজ" রমানন্দ একটি অপূর্ব্ব জিনিস। দুই এক কথায় তাহা কি বুঝাইব? তাহা বুঝাইবার নহে। গ্রন্থকার একস্থানে লিখিয়াছেন, "সে বলিয়াছিল এইরূপে শান্তি পাইবে, সে অনন্ত মানব-হৃদয়-সমুদ্রের কাণ্ডারী—সব জানে।" আমাদের বোধ হয়, যাঁহার মস্তিষ্ক হইতে ইহা বাহির হইয়াছে, তিনি মনোবিজ্ঞানে সম্যক্ অভিজ্ঞ—অতি উচ্চশ্রেণীর কবি। আধ্যাত্মিক উন্নতি যে দেশে একদিন চরম সীমায় উঠিয়াছিল, সেই আর্য্য দেশেই এইরূপ কল্পনা সম্ভবে। ইহার অধিক আর কি বলিব?

প্রায়শ্চিত্তের ফলে শৈবলিনীর মনে স্বামীর মহত্ত্ব অঙ্কিত হইল, শৈবলিনী স্বামীকে ভাল বাসিতে লাগিল।

একদিন আমরা যে শৈবলিনীকে বলিতে শুনিয়াছি, "কে তুমি? প্রতাপ না, কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছ?" আবার, "তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি, তোমার এই অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে ও রূপের জ্যোতিঃ কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল—" সেই শৈবলিনীকেই আবার আমরা আর একদিন অন্যরূপ দেখিতে পাইলাম। অনবরত মনে ভক্তিপ্রতিষ্ঠিত স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনীর চিত্ত বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উঠিল।

"বিকৃতি? না দিব্য চক্ষু? শৈবলিনী দেখিল—হৃদয়ের ভিতর অন্তর হইতে দিব্য চক্ষু পাইয়া, শৈবলিনী দেখিল, এ—কি রূপ! এই দীর্ঘ শালতরুনিন্দিত, সুভুজবিশিষ্ট, সুন্দরগঠন, সুকুমারে বলময় এ দেহ যে রূপের শিখর! সে ললাট—প্রশস্ত, চন্দনচর্চ্চিত, চিন্তারেখাবিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন! ইহার কাছে প্রতাপ? ছি! ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা! ঐ যে নয়ন জ্বলিতেছে, হাসিতেছে, ফিরিতেছে, ভাসিতেছে—দীর্ঘ, বিস্ফারিত, তীব্রজ্যোতিঃ, স্থির, স্নেহময়, করুণাময়, ঈষৎ রহস্যপ্রিয়, সর্ব্বতত্ত্বজিজ্ঞাসু—ইহার কাছে কি প্রতাপের চক্ষু? কেন আমি ভুলিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! এই যে সুন্দর, সুকুমার, বলিষ্ঠ দেহ—নবপত্রশোভিত শালতরু—মাধবীজড়িত দেবদারু, কুসুমপরিব্যাপ্ত পর্ব্বত, অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক শক্তি—আধ চন্দ্র আধ ভানু—আধ গৌরী, আধ শঙ্কর—আধ রাধা, আধ শ্যাম—আধ আশা, আধ ভয়—আধ জ্যোতিঃ আধ ছায়া—আধ বহ্নি আধ ধূম—কিসের প্রতাপ? কেন না দেখিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! সেই যে ভাষা—পরিষ্কৃত, পরিস্ফুট, হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গরঞ্জিত, স্নেহপরিপ্লুত, মৃদু, মধুর, পরিশুদ্ধ—কিসের প্রতাপ? কেন মজিলাম—কেন মরিলাম—কেন কুল হারাইলাম! সেই যে হাসি—ঐ পুষ্পপাত্রস্থিত মল্লিকারাশিতুল্য, মেঘমণ্ডলে বিদ্যুত্তুল্য, দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসবতুল্য, আমার সুখস্বপ্নতুল্য—কেন দেখিলাম না, কেন মজিলাম, কেন

মরিলাম। কেন বধিলাম না? কেন মোহ যে ভালবাসা বা সুখস্পৃহা—কপর্দক, অপদার্থ তাকে, অতুলমর্ম, আপনার বলে আপনি চঞ্চল—প্রশান্তহৃদয়ে স্থির, গম্ভীর, মধুর—মধু—কান্তরূপে ভুবনধর্মী জ্ঞানজ্যোতিঃ, অপার, অজেয়, অক্ষয়—কেন বুঝিলাম না? কেন হৃদয়ে তুলিলাম না?—কেন আপনা খাইয়া প্রাণ দিলাম না? কে আমি? তাঁহার কি যোগ্য—বালিকা, অজ্ঞান—অনক্ষর, অসৎ, তাঁহার মাহাত্ম্যজ্ঞানে অশক্ত, তাঁহার কাছে আমি কে? সমুদ্রে শঙ্খ, কুসুমে কীট, চাঁদে কলঙ্ক, চরণে রেণুকণা—তাঁর কাছে আমি কে? জীবনে কণ্টক, হৃদয়ে বিস্মৃতি, সুখে বিঘ্ন, আশায় অবিশ্বাস—তাঁর কাছে আমি কে? সরোবরে কর্দম, মৃণালে কণ্টক, পবনে ধূলি অনলে পতঙ্গ! আমি মজিলাম—মরিলাম না কেন?" অথবা "তখন সে (শৈবলিনী) মনে মনে ডাকিতে লাগিল,—'কোথায় তুমি স্বামিন্! কোথায় স্বামী—স্ত্রী-জাতির জীবন-সহায়, আরাধনার দেবতা, সর্বে সর্বমঙ্গল! কোথায় তুমি, চন্দ্রশেখর! তোমার চরণারবিন্দে সহস্র, সহস্র, সহস্র, সহস্র প্রণাম! তোমার নিকটে অপরাধ করিয়া আমি এই নরককুণ্ডে পতিত হইতেছি—তুমি রক্ষা না করিলে কোন্ দেবতায় আমায় রক্ষা করিতে পারেন না—আমায় রক্ষা কর। তুমি আমার রক্ষা কর, প্রসন্ন হও, এইখানে আসিয়া চরণ যুগল আমার মস্তকে তুলিয়া দাও—তাহা হইলেই আমি নরক হইতে উদ্ধার পাইব।"

শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের পূর্ব্বে যাহা অজ্ঞাত ছিল বলিয়া বোধ করিয়, ঠিক সেইজন্যই এখন আমরা তাঁহাকে সমধিক প্রকৃত দেখিতে পাইব।

পরিণাম সম্বন্ধে আর এক কথা বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে। শৈবলিনীর অনেক পাপ মনের প্রায়শ্চিত্তেই ক্ষয়াইয়া গেল, চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে গ্রহণ করিলেন।

এখন আমরা মোটের উপর মোটামুটি কতক কথা বলিতে চাহি। সাধু বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে।" এই কারণেই,—যে শৈবলিনীকে আমরা এক দিন বলিতে শুনিয়াছি "তাঁহাকে (চন্দ্রশেখরকে) আমি কখন ভালবাসি নাই—কখন ভালবাসিতে পারিব না—" সেই শৈবলিনীকে আবার প্রকারান্তর চন্দ্রশেখরকে ভালবাসাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধেই তিনি মুক্তকণ্ঠে লিখিয়াছেন "শৈবলিনীর চিত্তে চির প্রবাহিত নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু তাড়িত হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল।" আখ্যাকবি দেখাইয়া গেলেন যে, ভালবাসা সাধনার ফলে সর্বত্রই বিভাবিত হইতে পারে। মনের উপর এ সম্বন্ধে আমাদিগের প্রকৃষ্ট আছে। আর ইহা তিনি দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়াই শৈবলিনীকে পাপিষ্ঠা বলিতে পারিয়াছেন। শৈবলিনী কেন আগে এ সাধনা করে নাই—এই তাহার পাপ। আমাদিগের বোধ হয়, যাহারা বর্তমান শতাব্দীর বাহিরের কার্য প্রণালীর নিন্দা করিয়া বহিঃস্থ সমাজের দোষ দিয়া, এই গুরুতর পাপকার্য ব্যাখ্যা করিতে

ছাড়েন, তাঁহাদিগকে তিনি শিখাইয়াছেন যে, ইহা সাহিত্যের তত দোষ নয়, যত দোষ ব্যক্তি বিশেষের। তোমরা সমাজের নিন্দা করিয়া, হিন্দু-বিবাহ-প্রণালীর নিন্দা করিয়া শৈবলিনীকে সমর্থন করিতে পারিবে না, কারণ প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন, যে, শৈবলিনীর আধ্যাত্মিক শক্তি থাকিলে সকল দোষই মিটিতে পারিত। ইহাই শৈবলিনী-চরিত্রের নীতি বা উদ্দেশ্য।

৩। প্রতাপ।

বাস্তবে প্রতাপ অতুলনীয়। এই সংক্ষিপ্ত কথাটির মধ্যেই প্রতাপের সমগ্র চরিত্র নিহিত আছে—ইহাই তাঁহার সুচরিত্রের সমীচীন প্রশংসা। প্রতাপকে আমরা যখন যেখানে দেখিতে পাইয়াছি—তাঁহাকে এই অদ্বিতীয় বীরভাবেই দেখিতে পাইয়াছি। কি উপবনাগার যুদ্ধক্ষেত্রে, কি স্বকীয় আবাস ভবনে,——কি শৈশবে, কি যৌবনে,—কি জীবনে, কি মরণে,—সর্ব্বত্রই আমরা তাঁহার সেই বিপুল শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বীরত্ব দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি। প্রতাপ প্রভাবে বীর, প্রতাপ নম্রতায় বীর, প্রতাপ প্রণয়ে বীর, প্রতাপ জিতেন্দ্রিয়তায় বীর, প্রতাপ সজ্জনগণে বীর, প্রতাপ পরোপকারে বীর। প্রতাপ কার্য্যে বীর, প্রতাপ ভক্তিতে বীর, জ্ঞানেও বীর। এমন অদ্ভুত বীরত্বের সমাবেশ আর কোথাও দেখিয়াছ কি? তাই বলিতেছিলাম যে, প্রতাপের বীরত্ব দেখাইতে পারিলেই আমরা তাঁহার সমগ্র হৃদয়খানি দেখাইতে পারি।

তবে প্রতাপের সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ, [illegible] তাঁহার আত্মবাসনে। প্রতাপ তখন কিশোর বয়স্ক, তখন তাঁহার শৈবলিনী-আসক্তি [illegible] নীড় হইতে পক্ষিশাবক পলায় নাই' ও 'আত্মস্বত্ব সম্বন্ধে' [illegible] প্রকাশিত হইত। বাল্য প্রণয় ভালবাসাতেও শুধু সম্বন্ধ ছিল না। অজ্ঞান ছাড়াইয়া যখন প্রতাপ যৌবনে পদার্পণ করিলেন, ভালবাসার সঙ্গে 'বিবাহ' কথাটি জড়িত হইয়া তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল, যখন প্রতাপ বুঝিতে পারিলেন যে, শৈবলিনীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ অসম্ভব, তখনই আমরা এ আত্মত্যাগীর বীরত্ব দেখিতে পাইলাম। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—প্রণয় প্রতিরোধী অবস্থায় [illegible] প্রণয়-বল প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রতাপ বীরপুরুষ—আর প্রণয়ই যৌবনের আরাধ্য দেবতা, তাই প্রতাপের এখানে সেই বেগের সমীচীন [illegible]। যদি শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের বিবাহ হইত, পরিষ্কৃত ও আত্মবলির অর্থ অন্যরূপ দেখিতে পাইতাম; কিন্তু তাহা হইল না, তাই আমরা সেই আত্মবলিদানেচ্ছু প্রতাপকে ভাগিরথী-গর্ভে ডুবিয়া মরিতে চেষ্টিত দেখিলাম। শৈবলিনী ডুবিতে পারিল না, কিন্তু প্রতাপ পারিল। কারণ প্রতাপ বীর—এবং এই স্থলে তাঁহার অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশিত। ভালবাসায় প্রতাপের মত বীর কে?

চন্দ্রশেখর প্রতাপকে রক্ষা করিলেন। জল হইতে তাঁহাকে তুলিয়া বাটী লইয়া আসিলেন। বীর শত্রুগণের বীর সম্বন্ধ

জাতি ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। পুরুষ তাহার নীতি এক [illegible] নিবৃত্ত ছিল, এখন আর একটি বিষয় পাইল। ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা [illegible] প্রতাপের মত বীর কে?

চন্দ্রশেখর প্রতাপের চরিত্রে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। সুন্দরীর ভগিনী রূপসী কন্যা হইলে তাঁহার সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ ঘটাইলেন। [illegible] তাহাই নহে। চন্দ্রশেখরের জ্ঞাতি [illegible], তাহার কাছে বিশেষ প্রতিপত্তি। চন্দ্রশেখর নবাবের সরকারে প্রতাপের চাকরী করিয়া দিলেন। প্রতাপ দীর্ঘ [illegible] দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখরের এ ঋণ কি পরিশোধ করা যায়? কিন্তু তাহা প্রতাপ সম্যক্‌রূপে পরিশোধ করিয়াছিলেন। কিরূপে, তাহার পরিচয় আমরা ক্রমে দিতেছি।

প্রতাপের ভাগ্যে অদৃষ্টের জোর ছিল—[illegible] ইচ্ছাক্রমে শৈবলিনী বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হইলেন। প্রতাপের ভক্তির পাত্র ও প্রতাপের প্রেমের পাত্র সূত্রে মিলিত হইলেন। একের স্বার্থ অন্যের [illegible]। প্রতাপ এখন এক জনেরই নিকটে আবদ্ধ হইলেন—প্রতাপের বীরত্বের বিপদ পাইবার ক্ষেত্র হইয়া পড়িল। এবং চন্দ্রশেখরই প্রতাপের রক্ষা হইলেন। প্রতাপের গৌরব ফুটিয়া পড়িল। এ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবলিনীর বিবাহ না হইলে কি প্রতাপের চরিত্র এত ফুটিতে পারিত?

এখন এই চন্দ্রশেখরেই প্রতাপের সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ রহিল। প্রতাপ সেই চন্দ্রশেখরের সুখকেই জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া রাখিলেন। ইহাই তাঁহার জীবন-সম্বন্ধে একমাত্র পরিচায়ক হইল। আমরা তাহা বিবৃত করিয়া দেখাইতেছি।

এই সকল ঘটনার পরে প্রতাপের সহিত আমাদিগের পুনঃ দেখা—প্রতাপের নিজ বাড়ীতে। সহসা প্রতাপ শুনিলেন একজন বিধবা স্ত্রীলোক সুন্দরী বেদগ্রাম হইতে সে দিন ভগিনীকে দেখিবার জন্য প্রতাপের আলয়ে আসিয়াছিল।

অবকাশমতে প্রতাপ, সুন্দরীকে বেদগ্রামের সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যান্য কথার পর চন্দ্রশেখরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুন্দরী বলিলেন 'আমি সেই কথা বলিতেই আসিয়াছি, বলি শুন।' এই বলিয়া সুন্দরী চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর নির্বাসন-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া প্রতাপ বিস্মিত এবং স্তব্ধ হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে মাথা তুলিয়া প্রতাপ কিছু রুক্ষভাবে সুন্দরীকে বলিলেন, 'এতদিন আমাকে এ কথা বলিয়া পাঠাও নাই কেন?' সু। 'কেন, তোমাকে বলিয়া কি হইবে?' প্র। 'কি হইবে? তুমি স্ত্রীলোক, তোমার কাছে বড়াই করিব না। আমাকে বলিয়া পাঠাইলে কিছু উপকার হইতে পারিত।' সু। 'তুমি উপকার করিতে কি না, তা জানিব কি প্রকারে?' প্র। 'কেন তুমি কি জান না—আমার সম্পদ চন্দ্রশেখর হইতে?' সু। 'জানি কিন্তু শুনিয়াছি, লোকে বড় মানুষ হইলে পূর্ব কথা ভুলিয়া যায়।' প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া, অধীর এবং বাক্যশূন্য হইয়া উঠিয়া গেলেন।

পত্র দেখিয়া সুন্দরীর বড় আহ্লাদ হইল। পরদিন প্রতাপ, এক পাচক ও এক ভৃত্য মাত্র সঙ্গে করিয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিলেন। ভৃত্যের নাম রামচরণ। প্রতাপ কোথায় গেলেন, প্রকাশ করিয়া গেলেন না। কেবল রূপসীকে বলিয়া গেলেন, "আমি চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর সন্ধান করিতে চলিলাম; সন্ধান না করিয়া ফিরিব না।"

ইহার পরে আমরা দেখিলাম—প্রতাপ শৈবলিনীকে ফষ্টর-গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সে চেষ্টায় তাঁহার চতুরতা, তাঁহার অপরিসীম সাহস ও তাঁহার শারীরিক বীরত্ব সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। যখন এ কার্য্য শেষ হইল, প্রতাপ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। শৈবলিনীকে তিনি জগৎশেঠের গৃহে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভৃত্য তাহার নিজের ইচ্ছামতে তাঁহার গৃহেই শৈবলিনীকে লইয়া গিয়াছিল।

"প্রতাপ জ্বালিত প্রদীপালোকে দেখিলেন যে, শ্বেত শয্যার উপর কে নিস্পন্দ প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকালীন গঙ্গার স্থির শ্বেতবারি-বিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল শ্বেত পদ্মরাশি ভাসাইয়া দিয়াছে। মনোমোহিনী স্থির শোভা! দেখিয়া, প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, বা ইন্দ্রিয়বশ্যতা প্রযুক্ত যে, তাঁহার চক্ষু ফিরিল না, এমত নহে—কেবল অন্যমন বশতঃ তিনি বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল—অকস্মাৎ স্মৃতি-সাগর মথিত হইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল।" প্রতাপের জীবনের অগ্নি ভয়ানক পরীক্ষার দিন। ধার্ম্মিক পৌরুষশালীও এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। সে অবস্থা হইতেও এ অবস্থা অনেক কঠিন। শৈবলিনী একে বাল্যসহচরী—তাহে হৃদয়ের অধীশ্বরী। কিন্তু তবু প্রতাপ একটুকুও টলিলেন না—প্রতাপের মত জিতেন্দ্রিয় কে?

শৈবলিনী প্রতাপকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। প্রতাপকেই তাঁহার শুশ্রূষা করিতে হইল। শৈবলিনী সম্পূর্ণরূপে সুস্থির হইলে তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে তথা হইতে গমনোদ্যত হইলেন। শৈবলিনী বলিলেন, 'যাইও না।' প্রতাপ অনিচ্ছাপূর্ব্বক দাঁড়াইলেন। শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেন তোমরা আমাকে এখানে আনিলে? তোমাদের কি প্রয়োজন?' প্রতাপ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন, বলিলেন, 'তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখদর্শন করিতে নাই। তোমাকে ম্লেচ্ছের হাত হইতে উদ্ধার করিলাম—আবার তুমি জিজ্ঞাসা কর, এখানে কেন আনিলে?' শৈবলিনী ক্রোধ দেখিয়া ক্রোধ করিলেন না—বিনীতভাবে প্রায় বাষ্পগদ্গদ হইয়া বলিলেন, 'যদি ম্লেচ্ছের ঘরে থাকা আমার এত দুর্ভাগ্য মনে করিয়াছিলে—তবে আমাকে সেইখানে মারিয়া ফেলিলে না কেন? তোমাদের হাতে তো বন্দুক ছিল।' প্রতাপ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'তাও করিতাম—কেবল স্ত্রী-হত্যার ভয়ে করি নাই। কিন্তু তোমার

মরণই ভাল। শৈবলিনী কাঁদিয়া পায়ে লোটন স্মরণ করিয়া বলিল,—'আমার মরণই ভাল—কিন্তু আমি যাহা বলে বলুক তুমি আমায় এ কথা বলিও না। আমার এ দুর্দশা কাহা হতে? তোমা হতে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি। তোমার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথে কুপথ ভ্রান্ত হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য আমি গৃহ-ধর্ম্মে মন রাখিতে পারিলাম না? তোমারই জন্য। তুমি আমায় গালি দিও না।' প্রতাপ বলিলেন,'তুমি পাপিষ্ঠা, তাই তোমায় গালি দিই। আমার দোষ? ঈশ্বর জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নহি। ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া, ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়া-ছিলাম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ—তোমার প্রবৃত্তির দোষ। তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমার দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি?' শৈবলিনী গর্জ্জিয়া উঠিল—বলিল, 'তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে * * *' শুনিয়া, প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল—তিনি বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় পীড়িত হইয়া, সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।"

এইখানে প্রতাপের বিরুদ্ধে কতক-গুলি প্রবল বল দণ্ডায়মান হইয়াছিল; শৈবলিনীর সেই অতুল্য রূপ—সেই কাল—সেই স্থান—শৈবলিনীর সেই প্রণয়-প্রণয়োচ্ছ্বাস—আবার প্রতাপের জন্য শৈবলিনীর সেই দুঃখকাহিনী—সব একত্রিত হইল, কিন্তু তবুও প্রতাপ ধর্ম্মপথ-স্খলিত হইলেন না—মনে কুপ্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিলেন না। বরং শৈবলিনীকে তাঁহার জন্য যথোচিত ভর্ৎসনা করিলেন—সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। এ সব কত বড় বীরত্বের কথা? আবার দেখ, এত বড় বীরত্বের মধ্যেও কোমলতা কেমন মধুরভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে। প্রতাপ তখন শৈবলিনীর জন্য কাতর হইলেন। তাঁহার মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। 'তিনি বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।' ধন্য প্রতাপ! এরূপ বীরত্ব তোমাতেই দেখিতে পাই। জগতে তোমার তুল্য বীর কে? এরূপ পরীক্ষায় কয় জনে উত্তীর্ণ হইতে পারে? আর,—আর, এরূপ পরীক্ষা দ্বারা এরূপ চরিত্রের এরূপ বিকাশ কয় জনে দেখাইতে পারে? কাব্যাংশে এ স্থানটি অতীব মধুর ও কৌশলময়। ইহা দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় যে, 'চন্দ্রশেখর' বঙ্কিম বাবুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

ইহার পরে প্রতাপ বন্দীকৃত হইয়া ইংরাজ-সমীপে আনীত হইলেন। শৈবলিনী তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়া পূর্ব্বের ঋণটি পরিশোধ করিলেন। আবার আমরা দুই জনকে গঙ্গাবক্ষে সাঁতার দিতে দেখিলাম; সেই পুণ্যসলিলা ভাগি-রথীর দেশবাসিনী চন্দ্রকর বিধৌত সলিলরাশির উপরে পুণ্যমনা প্রণয়কাতর পবিত্র প্রেমপূর্ণ প্রতাপের সে দিনকার কথা মনে পড়িলে কাহার না বিস্ময় জন্মে?

সে কি সাধারণ ত্যাগ? যখন শৈবলিনী বলিল, 'এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ?' প্রতাপ বলিলেন 'আমি'।—কেন প্রতাপ? তোমার আবার দুঃখ কিসের? এই "আমি" বলাতে তোমার যে সুখ হইল, শত সহস্র শৈবলিনী উপভোগেও ত তাহা তোমার হইতে পারিত না! তোমার মত সুখী কে?

যিনি মানব-চরিত্র সম্বন্ধে অবগত নহেন, তিনি অবশ্য এ শপথে ইতর-জনোচিত কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না। এই রূপ 'ভাই-ভগিনী' সম্বোধনে তাঁহারা প্রতাপের মানবীয় দুর্ব্বলতা দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন—অথবা এ স্থলটি অপ্রতাপোচিত এবং গ্রাম্যকথায় পরিপূর্ণ বলিয়া গ্রন্থকারকে গালি পাড়িতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ স্থলটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। প্রতাপ আদর্শ চরিত্র হইলেও মানুষ ত বটে। অন্য মানবের ন্যায় তাঁহারও ত ইন্দ্রিয়-বিকার ছিল—নহিলে তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া প্রশংসা করিব কেন? প্রতাপকে যখন মানুষের মধ্যে আদর্শ-চরিত্র করা হইয়াছে, তখন মানুষের যাহা প্রকৃতি, তাঁহাতে না দেখাইলে চলিবে কেন—তাঁহাকে আদর্শ-চরিত্র বলিয়া আমরা গ্রাহ্য করিব কেন?—কাব্যস্থ হইয়া তিনি আমাদিগের মন এত আকর্ষণ করিতে পারিবেন কেন? কাজেই প্রতাপের সেই মনুষ্যের সাধারণ দোষটুকু ছিল। তাই ছিল বলিয়া আজি তিনি শৈবলিনী দ্বারা ঐরূপ শপথ করাইয়া লইলেন। এ শপথের মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য শৈবলিনীর প্রতাপ সম্বন্ধীয় কুপ্রবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন কিন্তু গৌণভাবে তাহারও মন স্থিরতর করা এ কার্য্যের লক্ষ্য ছিল। হিন্দু প্রতাপ গঙ্গাগর্ভে বসিয়া যদি ঐরূপ শপথে আবদ্ধ হয়েন, তবে এতৎসম্বন্ধে তাঁহার যতদূর সাবধানতা গ্রহণ করা আবশ্যক, তাহা করা হয়। গঙ্গাগর্ভে বসিয়া হিন্দু যুবক-যুবতী যদি ভাই-ভগিনী কিম্বা জনক দুহিতা সম্বন্ধে গ্রথিত হয়েন, তবে সে যুবক-যুবতীর পাপাচরণ সহজে সম্ভব নহে। প্রতাপ সে শপথে এতটা ভাবিয়াছিলেন। বিশুদ্ধ হিন্দু হইলে এ শপথের গভীর অর্থ অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোককে বা অপূর্ণ শিক্ষায় বিকৃত-মস্তিষ্ক হিন্দুকে ইহার তাৎপর্য্য একটু ভাবিয়া বুঝিতে হইবে। অন্য সময়ে এ কথা লেখাও অতিরিক্ত বোধ হইত।

ইহার পরে প্রতাপের সহিত দেখা আবার তাঁহার নিজ বাড়ীতে। প্রতাপ তখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন—

"প্রতাপ প্রথমে মনে করিলেন, "আমিই শৈবলিনীর মৃত্যুর কারণ।" কিন্তু ইহাও ভাবিলেন, "আমার দোষ কি? আমি ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্ম পথে যাই নাই। শৈবলিনী যে জন্য মরিয়াছে (প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে শৈবলিনী সে দিন গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিয়াছে) তাহা আমার নিবার্য্য কারণ নহে। অতএব প্রতাপ নিজের উপর রাগ করিবার কারণ পাইলেন না। চন্দ্রশেখরের উপর কিছু রাগ করিলেন—চন্দ্রশেখর কেন শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন? রূপসীর উপর রাগ করিলেন, কেন শৈব-

লিনীর সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ না হইল, রূপসীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল। সুন্দরীর উপর আরও একটু রাগ করিলেন—সুন্দরী তাহাকে না পাঠাইলে, প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর প্রণয়সঞ্চার ঘটিত না, শৈবলিনীও মরিত না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লরেন্স ফষ্টরের উপর রাগ হইল—যে শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী না করিলে এ সকল কিছুই ঘটিত না। ইংরেজ জাতি বাঙ্গালায় না আসিলে, শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের হাতে পড়িত না। অতএব ইংরেজ জাতির উপরও প্রতাপের অনিবার্য্য ক্রোধ জন্মিল। প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিলেন, ফষ্টরকে আবার ধৃত করিয়া বধ করিয়া আত্ম সংকল্প সিদ্ধ করিতে হইবে। নহিলে সে আবার [illegible]—শেষ দিলে আগুন জ্বলিয়া উঠিতে পারে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই করিলেন যে ইংরেজ জাতিকে বাঙ্গালা হইতে উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য, কেননা ইহাদিগের মধ্যে অনেক ফষ্টর আছে।”

কি সুন্দর—কি স্বাভাবিক—কি প্রতাপোচিত চিন্তা! এই চিন্তায় কবিপ্রবর আমাদিগের দেশের একটি অতি গূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহাকে দেশহিতৈষিতা বলে, তাহা আমাদিগের দেশে এইরূপ কারণেই সমুত্থিত হইবে। রমণীর সতীত্ব ভারতে বড়ই মূল্যবান বস্তু, ঐ বস্তুতে কেহ হস্তক্ষেপ করিলে [illegible] দেহেও অপরিমিত বলের সঞ্চার হয়। ইতিহাস ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত স্থল। রাজপুতানায় অদ্ভুত বীরত্ব ও দে[illegible]যশ প্রায় এই কারণেই উৎপন্ন। তাঁহাদিগের সেই পরম পবিত্র সাবিত্রীতুল্য রমণীর অঙ্গ মুসলমানে স্পর্শ করিবে?—দেবতার আদরের জিনিস [illegible] উপভোগ করিবে?—যে পর্য্যন্ত তাহাদিগের হৃদয়ে এক বিন্দুও শোণিত থাকিবে, তাহারা তাহা পারিবে না। এই কারণেই আমরা রাজপুতনার রণস্থলে অদ্যাপি অতুল্য সেইরূপ বীরত্বের ক্রীড়া দেখিতে পাই—এই প্রাণের ধনে আঘাত লাগিবে বলিয়াই তাহাদিগের সেইরূপ স্বদেশরক্ষার্থ চেষ্টা বা দেশভক্তি দেখিতে পাই। এখনও দেখ, বাঙ্গালী মৃত্যুকে যে এত ভয় করে, তবু এ সতীত্ব রত্ন যেখানে অপহৃত হয়, সেখানে এ ভয় থাকে না। সেখানে ভয়োবিহ্বলের দুর্ব্বল বাহুতেও অপরিমিত বলের সঞ্চার হয়। ইংরেজ আমাদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিলেও, হাতে ধরিয়া জুতা মারিলেও, বাঙ্গালী একা তদ্বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিবে না। কিন্তু যদি একবার ইংরেজ সদর্পে ভুলিয়া, [illegible] আমাদের অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়েন—এই রুগ্ন, জীর্ণ, দুর্ব্বল বাঙ্গালিকুলের প্রত্যেকে এবং সকলেই তৎপ্রতিবিধানার্থ প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। এইরূপ একটা কারণ না ঘটিলে, এইরূপ একটা অত্যাচার না হইলে, দেশভক্তি স্ফুরিতে পারে না। বিজাতীয় অত্যাচারই বিজিতের দেশভক্তি উত্তেজিত করিয়া থাকে। আমাদিগের মহাকবি ঐ কয়েকটি কথায় এতগুলি তত্ত্ব বুঝাইয়া গেলেন। প্রতাপ এই কারণেই স্বদেশরক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিলেন। এই কারণেই তিনি অল্প দিনের মধ্যে প্রসিদ্ধ সেনাপতি গুরগণ খাঁরও চিন্তার বিষয় হইলেন।

এক্ষণে প্রতাপ ইংরাজদিগকে বিদূ-

ষিত করিতে নানাবিধ উপায় কল্পনা করিতে লাগিলেন। "তার পর ভাবিলেন আমি কেন এত করিব? করিব, তাহার অনেক কারণ আছে। প্রথম, ইংরেজ চন্দ্রশেখরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে; দ্বিতীয়, শৈবলিনী মরিয়াছে; তৃতীয়, আমাকে কয়েদ রাখিয়া ছিল; চতুর্থ, এইরূপ অনিষ্ট আর আর লোকেরও করিয়াছে ও করিতে পারে * * অতএব আমি ইহা করিব।"

প্রতাপ তাঁহার যুদ্ধানুষ্ঠানকারী ইংরাজের অনিষ্টসাধনের প্রথম কারণ দেখিলেন,—'ইংরেজ চন্দ্রশেখরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে'!

তার পরে প্রতাপকে আমরা দেখিলাম সেই উদয়নালার যুদ্ধক্ষেত্রের পথে। প্রতাপের সেই শেষ দিন। পথে শৈবলিনীর সহিত তাঁহার কিরূপ কথোপকথন হইল, তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। শৈবলিনীর শেষ কথা শুনিয়া, "প্রতাপ আর উত্তর করিলেন না। দ্রুতপদে অশ্বারোহণ করিয়া, অশ্বে কশাঘাত পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। গমনকালে চন্দ্রশেখর, ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা যাও?' প্রতাপ বলিলেন 'যুদ্ধে।' চন্দ্রশেখর ব্যগ্রভাবে, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'যাইও না যাইও না। ইংরাজের যুদ্ধে রক্ষা নাই।' প্রতাপ বলিলেন, 'ফষ্টর এখনও জীবিত আছে। তাহার বধে চলিলাম।' চন্দ্রশেখর দ্রুতবেগে আসিয়া প্রতাপের অশ্বের বল্গা ধরিলেন। বলিলেন, 'ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান তাহার দণ্ড বিধান করিবেন। তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা? যে অধম সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে; যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে।' প্রতাপ বিস্মিত, পুলকিত হইলেন। এরূপ মহতী উক্তি তিনি কখন লোকমুখে শ্রবণ করেন নাই। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, চন্দ্রশেখরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, 'আপনিই মনুষ্য মধ্যে ধন্য। আমি ফষ্টরকে কিছু বলিব না।'" দেখিলে এখন বীর প্রতাপকে? মহত্ত্ব অনুভব করায়, মহত্ত্বের নিকট মস্তক অবনত করায়, প্রতাপের মত বীর কে?

যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রতাপ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। প্রতাপ যে কেন প্রাণত্যাগ করিলেন, তাহা তিনি মৃত্যুকালে এইরূপে বুঝাইয়াছেন। "শৈবলিনী বলিয়াছিল যে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে তাহার আর সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা আমার পরম প্রীতির পাত্র, যাঁহারা আমার পরমোপকারী, তাহাদিগের সুখের কণ্টকস্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাই, আপনাদিগের নিষেধ সত্ত্বেও এ সমরক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করিতে আ[illegible]ছিলাম। আমি থাকিলে, শৈ[illegible], কখন না কখন বিচলিত হই[illegible]না। অতএব আমি চলিলাম[illegible]াপ কেবল নিজের হৃদয়কে অবি[illegible]িয়া বা সংযত না রাখিতে পারি[illegible] প্রাণত্যাগ করেন নাই—তিনি থাকি[illegible] কখন না কখন শৈবলিনীর চিত্ত বি[illegible]ইবার সম্ভাবনা—তাই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

এক এক করিয়া আমরা প্রতাপ জীবনের সমস্ত কার্য্যই পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম—আমরা প্রতাপকে যখনই দেখিয়াছি, তখনই তাঁহাকে চন্দ্রশেখরের হিতকামনায় কার্য্যতৎপর দেখিয়াছি। তাঁহার কার্য্য সমস্তই চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর জন্য। প্রতাপ রূপসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর জন্য। * ফষ্টরকে শাস্তি প্রদান করিয়া শৈবলিনী উদ্ধার করিয়াছেন, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর জন্য। ইংরেজ কর্ত্তৃক বন্দী হইলেন, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর জন্য; যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর জন্য;—আর একটি কথা যদি তোমরা বলিতে দেও, তাহা হইলে বলি,—প্রতাপ জীবনত্যাগ অপেক্ষাও যে দুর্দ্দমনীয় শৈবলিনীর আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ, করিয়াছেন—চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর জন্য। কিন্তু কারণ যাহাই থাকুক, তাহা প্রতাপের পক্ষে, রূপসীর পক্ষে ত এ সব কিছুই ছিল না। * তবে প্রতাপ কিরূপে রূপসীকে স্বচ্ছন্দচিত্তে বিবাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? পাশ্চাত্য [illegible] নীতিতত্ত্বজ্ঞগণ এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। ইহার উত্তরে আমার অনেকেই বলিতে পারেন, "প্রতাপ যেমন শৈবলিনীকে ভালবাসিত বলিয়া যে রূপসীকে ভালবাসিত না, তাহা তুমি কিরূপে বুঝিলে? প্রতাপ সাহেবের চিত্র নহে, বাঙ্গালীর চিত্র। প্রতাপের জন্ম সেই দেশে, যেখানে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কল্পনা হইতে যেখানে দুষ্মন্ত ও সূর্য্যমুখী, অমর ও রোহিণী, নন্দী ও রমা একই ব্যক্তির প্রণয়পাত্রী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।" আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নকারীকে অন্য কোন উত্তর না দিয়া একটি গল্প বলিব। গল্পটির সারাংশ কোন ইংরাজী পুস্তক হইতে গৃহীত। কোনও এক ব্যক্তি পরোপকারের জন্য আত্মহত্যা করিয়াছিল। একদিকে আত্মহত্যা মহাপাপ, অন্যদিকে পরোপকার মহাব্রত, এই দুইটি বৈষম্যের সমাধান এক্ষণে হইবে জানিতে না পারিয়া ধর্ম্মরাজ সাহেব প্রাতঃকালে এই কার্য্যটি উঠাইলেন। কিন্তু যাই তাহা লেখা হইল, অমনি এক ফোঁটা চক্ষের জল পড়িয়া অক্ষরগুলি মুছিয়া গেল। বোধ হয় এ গল্পটি শুনিয়া প্রশ্নকারিগণ নিরুত্তর থাকিতে পারেন। যদি বাস্তবিকই প্রতাপ বিবাহ করিয়া কোন দুর্নীতির কার্য্য করিয়া থাকেন, তবে তাহার কার্য্যগুলি ভাবিয়া দেখিলে, সে দোষের দাগ মুছিয়া যায় না কি?

* এই বিবাহসম্বন্ধে কয়েকটি কথা এখানে বলিয়া লইতে হইল। শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের প্রগাঢ় অনুরক্তি সত্ত্বেও প্রতাপ রূপসীকে বিবাহ করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতে চাহি যে আমাদিগের মতে তিনটি উদ্দেশ্যে কবি প্রতাপের এই বিবাহটি ঘটাইয়াছেন। (১) প্রতাপের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহাতে তিনি বিবাহ না করিলে এত সহজে—আর সহজেই বা কি করিয়া বলি?—শৈবলিনীর উপরে প্রেম আকাঙ্ক্ষা একেবারে ত্যাগ করিতে পারিতেন না। এ কথাটি সকলেরই স্মরণ করা উচিত। (২) প্রতাপ সর্ব্বদাই চন্দ্রশেখরের আজ্ঞাধীন। "চন্দ্রশেখর প্রতাপের চরিত্রে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। সুন্দরীর ভগিনী রূপসী বয়স্থা হইলে তাহার সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ ঘটাইলেন।" ইহাতে যেন গ্রন্থকারের অভিপ্রায় রহিয়াছে যে, প্রতাপ চন্দ্রশেখরের ইচ্ছানুসারে বিবাহ [illegible] ছিলেন। (৩) প্রতাপ ভাবিয়াছিলেন বিবাহ করিলে [illegible] শৈবলিনীকে ভুলিতে পারিবেন, [illegible] একান্ত কর্ত্তব্য। আরও মনে করিয়া [illegible] তাহারা শৈবলিনীর হৃদয়ে প্রতাপ [illegible] কামনার উৎপাটন হইবে, কিম্বা [illegible] আসিয়া ছিল হৃদয়ে জানিয়া শৈবলিনীর [illegible] একেবারে বিলুপ্ত হইবে। চন্দ্রশেখরের [illegible] হয়, যাহাতে একরূপ সুচনা প্রকাশিত হয়, [illegible] কথা একান্ত কর্ত্তব্য। বোধ হয়, এই [illegible] একত্রিত করিয়া প্রতাপ এই বিবাহ [illegible] করেই বলিতে পারি, প্রতাপ রূপসীকে [illegible]

তাহাও করিয়াছিলেন, অনেকটা চন্দ্রশেখরের জন্য। কথাটিতে বোধ হয় প্রতাপের মহত্ত্ব বিন্দুমাত্রও খর্ব্বিত হয় না; চন্দ্রশেখরের জন্য শৈবলিনীর আকাঙ্ক্ষা ত্যাগে তাঁহার যথেষ্ট মহত্ত্ব ও যথেষ্ট ইন্দ্রিয়বিজয়ের পরিচয় রহিয়াছে। কঠোর নীতিতত্ত্বজ্ঞগণ এ কথা শুনিয়া আমাকে কি বলিবেন জানি না। কিন্তু আমাদিগের নিকট এই কথাটিতেই যেন প্রতাপ-চরিত্রের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য নিহিত আছে, ইহার জন্যই প্রতাপ-চরিত্র আমাদিগের মনোরঞ্জন করিতে এত সমর্থ হইয়াছে।

ইহাতেও কি চন্দ্রশেখরের ঋণ পরিশোধ হয় নাই? এমন কৃতজ্ঞতা কি আর কোথাও দেখিয়াছ? এমন এক বৃত্তির অধীন সমস্ত জীবন-কার্য্য কখন কি দেখিয়াছ? এমন পরার্থে জীবনের সর্ব্বস্ব-বিনিময় কখন কি দেখিয়াছ? প্রতাপ মানুষের মধ্যে বীরত্বে অদ্বিতীয় নয় কি? এ প্রতাপকে আমরা কিরূপে প্রশংসা করিব? আর—আর সেই প্রতাপের প্রণয়? সেই পূর্ণ উদ্দীপিত অথচ সংযত—সেই প্রগাঢ়, কল্পিত বিস্মিত, অপার্থিব, অশরীরিময়, অসংস্পর্শ প্রণয়? তাহা কি বলিবার? তাহা কি বুঝাইবার? কবি ভিন্ন আর কে তাহা বুঝাইতে পারে না। আমাদিগের কবিবর তাহা একস্থলে কি সার একত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রতাপের তদানীন্তন অবস্থা, প্রতাপের তাৎকালিক ভাব, আর তাঁহার সেই আবেগ—একত্রিত হইয়াই সেই ভাবের ছায়ামাত্র দেখাইতে পারিয়াছে। সে প্রেমের চিত্র ধারণা করিতে, স্মৃতিপথে আনিলেই প্রতাপের সেই কথাই উদিত হয়।

"কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে, আজি এই ষোড়শ বৎসর, আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম—জীবনবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। কখন মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা জানিতে পারিত না; এই মৃত্যুকালে আপনি সে কথা তুলিলেন কেন? এ জন্মে অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া, এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম। আমার মন কলুষিত হইয়াছে *। কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে? আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায় নাই, তাই মরিলাম। আপনি এই গুপ্ত তত্ত্ব শুনিলেন—আপনি জ্ঞানী, আপনি শাস্ত্রদর্শী আপনি বলুন, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী? যদি দোষ হইয়া থাকে, এ প্রায়শ্চিত্তে কি তাহার মোচন হইবে না?"

এ ভাবের আর ভাবান্তর হয় না। প্রতাপ মরণেও মহাবীর।

এখন রমানন্দস্বামীর মত আমরাও প্রতাপের সেই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে

---

* এই কথাটিতে সেই শপথের কারণ ব্যক্ত দেখিতে পাই। এমন সত্যতেও প্রতাপ বীর! এমন করিয়া মন পড়িতে কয়জনে পারে?

পারি,—'তাহা জানি না। মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ; শাস্ত্র এখানে মূক। তুমি যে লোকে যাইতেছ, সেই লোকেশ্বর ভিন্ন এ কথার কেহ উত্তর দিতে পারিবে না। তবে, ইহাই বলিতে পারি, ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী।' রমানন্দস্বামীও প্রতাপকে বলিয়াছিলেন—'এ সংসারে তুমি যথার্থ পরহিতব্রতধারী। আমরা ভণ্ড মাত্র।' 'প্রার্থনা করি জন্মান্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।'

"তবে যাও প্রতাপ, অনন্তধামে যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও। যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে যাও। লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভালবাসিতে চাহিবে না।"

আর তোমার আত্মসঙ্কল্পটি বঙ্গধামে পবিত্র হইয়া অক্ষয়কাল বিরাজ করুক—"চন্দ্রশেখর" সাহিত্যরাজ্যে অমর হইয়া থাকুক।

৪। অন্যান্য চরিত্রাবলী।

এই নভেলে নানা প্রকারের চরিত্র সন্নিবেশিত থাকিলেও, তাহা বৈচিত্র্য জন্য পাঠকবর্গের সম্যক প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। কিন্তু সকল চরিত্রই কিছু মনুষ্য জীবনের কঠিন সমস্যার ব্যাখ্যা জন্য কল্পিত হয় না—অন্ততঃ অতি অল্পই তজ্জন্য সৃষ্ট হইতে দেখা যায়। অপরগুলির কার্য্য প্রয়োজনে বহুবিধ হইয়া থাকে। কোনটী বা মূলচরিত্র বিকাশের জন্য প্রথমে কল্পিত হইয়া শেষে অপর কোন উদ্দেশ্য সাধন বা নূতন কোন সৌন্দর্য্যের অবতারণা করে। নবাব ও ইংরাজ লইয়া কারবার করিতে গ্রন্থকারের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে,—অর্থাৎ রাজনীতির কোন সমস্যা ব্যাখ্যা করিবার জন্য ইহা রচিত হইতে পারে, কিন্তু আমরা তাহা ব্যাখ্যাযোগ্য মনে করিলাম না। নবাব-চরিত্র ও ইংরাজ চরিত্র, আমাদিগের সমালোচ্য বিষয় নহে।—আমরা এই স্থানে কেবল দুইটি অত্যুজ্জ্বল চরিত্র সম্বন্ধেই দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। সে চরিত্র দুইটী—রমানন্দস্বামী ও দলনী।

দুই এক কথাতেই রমানন্দস্বামীর উন্নত চরিত্রটি বড় সুন্দর ফুটিয়াছে। তাঁহার জ্ঞান অপরিসীম, তাঁহার দয়া অপরিসীম, তাঁহার সদ্বিবেচনাও অপরিসীম। তিনি কাব্য মধ্যে কেবল চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের সম্মুখেই বিকশিত হইয়াছেন—তিনি চন্দ্রশেখরের গুরু। তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সত্য, কিন্তু প্রতাপের সহিত তাঁহার শেষ দিনের কথাবার্ত্তায় তাঁহার অপরিসীম মনুষ্যত্ব জ্ঞান দেখিয়া বোধ হয় যেন, তিনিও সংসারে এক দিন প্রণয়ী ছিলেন। সেই সন্দীপ্ত প্রণয়ই তাঁহার এই দিব্যজ্ঞানের [illegible]

কারণ স্বরূপ। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে রমানন্দস্বামীই সে প্রণয়ের মধ্য উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণয়ের নিকট চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের প্রণয়ও অবনত হইয়া পড়ে। প্রণয়ের চরম উৎকর্ষ চন্দ্রশেখরের প্রণয়েরও পরের স্তর রমানন্দস্বামী দেখাইয়া গিয়াছেন। এই রমানন্দস্বামী সম্বন্ধে আর যাহা বলিবার তাহা অন্যত্র বলিতে ইচ্ছা রহিল। এ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আমরা অনেক স্থানে অনেক ভাবে দেখিয়াছি ও ভবিষ্যতেও দেখিতে ভরসা রাখি।

শৈবলিনীর প্রণয়ে যেরূপ প্রণয়ের উগ্রমূর্ত্তিটি প্রদর্শিত হইয়াছে, দলনীর প্রণয়ে আবার সেইরূপ প্রণয়ের শান্ত ও মোহনচ্ছবি দেখান হইয়াছে। একটিতে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের খরতর প্রভা দেখিতে পাই, অন্যটিতে শারদীয় পূর্ণিমার বিমল, স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ দেখিতে পাই। একটির প্রণয় বাধা পাইয়া উগ্রভাব ধরিয়াছিল, অন্যটির প্রণয় ... নীরবে স্রোতস্বিনীর ন্যায় বহিয়া যাইতেছিল। একটির প্রণয় কলুষিত, অন্যটির প্রণয় পবিত্র। এইরূপ সর্ব্বথা বিপরীত ভাব লইয়া দলনী বেগম চন্দ্রশেখর গ্রন্থের একটি অতি অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে।

৫। ভাষা—বর্ণনা—ঘটনা—মন্তব্য

চন্দ্রশেখরের ভাষা সম্বন্ধে এখন কিছু বলা হইবে না। চন্দ্রশেখরের বর্ণনাগুলি অতীব মনোহর। যেরূপ মনোহর, সেইরূপই আবার ইহার সংখ্যাও অধিক। প্রায় ইহার প্রত্যেক পাতায় কবির সেই বিস্ময়কর বর্ণনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানেই একটি হৃদয় বিচলনকর ঘটনা পড়িয়াছে, সেইখানেই আমরা ততোধিক হৃদয়মুগ্ধকর বর্ণনার সমাবেশ দেখিয়াছি। উপক্রমণিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার শেষ পর্য্যন্ত সেই বর্ণনায় পরিব্যাপ্ত। এরূপ মনোহর বর্ণনার আতিশয্য তাঁহার অন্য কোন গ্রন্থে আছে কি না সন্দেহ। ইহার কোনটি রাখিয়া কোনটি উদ্ধৃত করিব?

চন্দ্রশেখরের ঘটনাও অসংখ্য, ইহার সমস্ত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমরা তন্মধ্যে এই কয়েকটি ঘটনার বিশেষ করিয়া দেখিতে পাই :—(১) শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের সাক্ষাৎ (চন্দ্রশেখরের গৃহ পরিত্যাগের পর) (২) শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের গঙ্গাবক্ষে শপথ (৩) শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত (৪) শৈবলিনীর উন্মত্ততা। এই শেষোক্ত ঘটনাটী সাধারণ দৃষ্টিতে যেরূপই প্রতীয়মান হউক না কেন, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ... হয়। শৈবলিনীর হৃদয় প্রতাপের ... যখন সেই প্রতাপকে সে জোর করিয়া হৃদয় হইতে তাড়াইয়া দিল, তাহার উন্মত্ততা প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইয়া পড়িল। প্রতাপাসক্তি বিদূরিত হইয়া চন্দ্রশেখরের ভক্তি ও প্রণয় হইবার অগ্রে এটি না হইলে একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া পড়িত। ইহাতে প্রতাপাসক্তিও বেশ ঘুচিয়াছে, আবার চন্দ্রশেখরে ভক্তি ও ভালবাসা জন্মিবার স্বাভাবিকতাও বেশ প্রমাণ করিয়াছে। উন্মত্ততার পরে যেন শৈবলিনীর নূতন জীবন আরম্ভ হইল। আর সেই উন্মাদকালীন প্রলাপেও

কবির অসাধারণ দার্শনিক প্রতিভা প্রকাশিত দেখা যায়। শৈবলিনীর উন্মত্তাবস্থার প্রকৃতি ও কারণ সেই প্রলাপে অস্ফুটভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

"চন্দ্রশেখর" গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কবির সম্বন্ধে দুইরূপ প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। একরূপ, কাব্যচিত্রিত চরিত্রাবলীর মহত্ত্ব, সৌন্দর্য্য ও মনোহারিত্ব জন্য—অন্যরূপ, সেই চরিত্রাবলীর উদ্দেশ্য ও শিল্পচাতুর্য্য জন্য। একরূপ, কাব্যের—অন্যরূপ কবির। প্রথম প্রকারের প্রশংসাকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক প্রকারের প্রশংসা জগতের অসীম, অনন্ত সৌন্দর্য্যভাণ্ডার হইতে জাল দেখিয়া সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া যত্নাতিশয়ে একটি অভিনব প্রকল্প জন্য—অন্য প্রকারের প্রশংসা, সসীম, নির্দিষ্ট ও পরিমিত উপকরণ লইয়া একটি অপূর্ব সৌন্দর্য্য চিত্রণ জন্য। দ্বিতীয় প্রকারের, যখন সেই উদ্দেশ্য বা অভীপ্সিত বিষয়টি কোন এক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি (এখানে ইহা প্রথম প্রকারের দ্বিতীয় বিভাগের সহিত মিলিয়া গেল—কারণ ইহাকে অবশ্যই পরিমিত উপকরণ লইয়া কাজ করিতে হইবে) অন্য প্রকারের, যখন সেই উদ্দেশ্য এই মানব জীবনের কঠিন সমস্যাগুলির বিশদ ব্যাখ্যা। এই বিভাগে আমরা কেবল মুখ্য অংশটাই গ্রহণ করিয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে কাব্যে দুই প্রকারের কথাই মিশ্রিত থাকে। তবে, যেটি মুখ্য ও উজ্জ্বল, আমরা একমাত্র তাহাকেই গ্রহণ করিয়া এইরূপ বিভাগ করিলাম। এখন আমাদিগের কথাটি বলে এইরূপ দাঁড়াইল। কাব্যে তিন প্রকারের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে। এক প্রকারের—অসীম, অনির্দিষ্ট, অনন্ত উপকরণ হইতে আহরণ করিয়া, চিত্তমুগ্ধকর ও উন্নত চরিত্র সৃষ্টি—এক প্রকারের, পরিমিত, নির্দিষ্ট ও সীমাবিশিষ্ট উপকরণ লইয়া কোন এক নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি—এক প্রকারের অসীম, নির্দিষ্ট ও পরিমিত উপকরণ লইয়া মানব জীবনের কোন কঠিন সমস্যার ব্যাখ্যা। "স্বর্ণলতা," "বিষবৃক্ষ," "কৃষ্ণকান্তের উইল" প্রভৃতি এই শেষোক্ত প্রকারের উদ্দেশ্যে লিখিত। তবে "স্বর্ণলতা"র উদ্দেশ্য অতি স্থূল—উদ্দেশ্যসাধনে গ্রন্থকার সম্যক সমর্থ হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার প্রশংসা—নতুবা ইহাতে মানব-জীবনের কোন কঠিন সমস্যা ব্যাখ্যাত হয় নাই। "বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল"ই এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসদ্বয়। তন্মধ্যে আমরা "কৃষ্ণকান্তের উইল"কেই অগ্রে। "কৃষ্ণকান্তের উইলের" রচয়িতাকেই বেশি প্রশংসা করি; কারণ ইহার উপকরণ অতি সামান্য ও ইহার সমস্যাটিও অপেক্ষাকৃত জটিল প্রকৃতির। দ্বিতীয় প্রকারের কাব্য মধ্যে "কপালকুণ্ডলা" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিন চারিটি বনফুল লইয়াই ইহাতে একটি অপূর্ব্ব মালা গ্রথিত হইয়াছে। শাদার উপর এমন সুন্দর শাদা ও মনোমুগ্ধকর কার্য্য, বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসে আর দেখা যায় না। আর, প্রথম প্রকারের কাব্য মধ্যে "চন্দ্রশেখর" অতি উচ্চ স্থান অথবা অতি

উচ্চ ই বা কেন বলি, বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। ইহার চন্দ্রশেখর ও প্রতাপও, কাব্য জগতের অতুল সামগ্রী। এরূপ মহৎ ও উন্নত হৃদয়ের চরিত্র তাঁহার গ্রন্থ মধ্যেও আর পরিদৃষ্ট হয় না।

আমরা এই শ্রেণী বিভাগ করিয়া এক দায় হইতে উদ্ধার পাইলাম। আমরা কখন "কৃষ্ণকান্তের উইল"কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়াছি, কখন "চন্দ্রশেখর"কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়াছি, তাহার মর্ম্ম এতক্ষণ ব্যাখ্যাত হয় নাই। এখন তাহার কারণ স্পষ্টীকৃত হইল না কি?

সমাপ্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র।

দ্বিতীয় ভাগ।

দুর্গেশনন্দিনী।

ইতিবৃত্ত।

"দুর্গেশনন্দিনী" বঙ্কিম বাবুর প্রকাশিত সর্ব্ব প্রথম উপন্যাস। কিন্তু ইহা তাঁহার সর্ব্ব প্রথম লিখিত উ[illegible] নহে। "দু[illegible]নন্দিনীর" পূর্ব্বে তিনি বঙ্গভাষায় আর একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, ইতি পূর্ব্বে ইংরাজীতেও তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস কোন ইংরাজী কাগজে প্রকাশিত হয়। সে প্রাচীন কাগজ এখন দুর্লভ—এবং সে বঙ্গভাষায় লিখিত উপন্যাসও এখন পাইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং, তৎসম্বন্ধে কিছুই আমরা পাঠকবর্গকে বলিতে পারিলাম না। তবে, বাঙ্গলা উপন্যাসখানি সম্বন্ধে একটি রহস্যের কথা আছে। বঙ্কিম বাবু যখন কলেজে পড়েন, তখন কলিকাতায় বঙ্গ-সাহিত্য-লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য একটি সভা ছিল। সেই সভা হইতে প্রতি বৎসরে শ্রেষ্ঠ বঙ্গীয় লেখককে পুরস্কার দেওয়া হইত। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র এই পুরস্কার প্রত্যাশায় উক্ত উপন্যাসখানি প্রেরণ করেন। কিন্তু তখনকার সভা সে পুস্তকখানি পুরস্কারযোগ্য মনে না করিয়া, অন্য একখানি গ্রন্থলেখককে সেই পুরস্কার প্রদান করেন। সেই পুরস্কার প্রাপ্ত পুস্তকের নাম এখন কেহই শুনিতে পাইবেন না। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই পুরস্কারের জন্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সভার বিবেচনায় এ সব পুস্তক পুরস্কৃত হইল না। তখনকার বঙ্গীয় সাহিত্য-লেখকগণের সহিত বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের ও সমালোচকবর্গের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, ইহাতেও খানিকটা বুঝা যায়।

"দুর্গেশনন্দিনী" ইংরাজী ১৮৬৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসখানি লিখিতেও নবীন গ্রন্থকার তত উৎসাহ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই; পক্ষান্তরে,

নিকটও যথেষ্ট হইয়াছিলেন। দুর্গেশনন্দিনীর কিয়দংশ কাপি প্রস্তুত করিয়া, গ্রন্থকার তাঁহার অগ্রজ সঞ্জীব বাবু, ও বন্ধুবর ইঞ্জিনিয়ার ক্ষেত্রবাবুকে প্রদর্শন করেন। তাঁহারা উপন্যাসখানিকে প্রকাশযোগ্য মনে করিলেন না। তখন গ্রন্থকার ইহাতে কিছু বাধা প্রাপ্ত হইয়া আপাততঃ সে কার্য্য স্থগিত রাখেন। অদৃষ্টবাদীরা বলেন,—যাহা হইবার তাহা হইবেই। তাই বুঝি গ্রন্থকার তখন বন্ধুবান্ধবশূন্য একাকী স্থানে স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে প্রেরিত হইলেন। সেখানে কার্য্যান্তর দ্বারা অবসর সময় অতিবাহিত করার সুবিধা না থাকায় গ্রন্থকার গ্রন্থখানি পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দিন পরে সঞ্জীব বাবু তথায় কনিষ্ঠের নিকট ভ্রমণোপলক্ষে উপস্থিত হইলেন। তখনও দুর্গেশনন্দিনী সমাপ্ত লিখিত হয় নাই। সেই অসমাপ্ত কাপি সঞ্জীব বাবু তখন পাঠ করিয়া, গ্রন্থকারের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্যে কলিকাতায় ছাপাইতে লইয়া গেলেন। এইরূপে দুর্গেশনন্দিনী সম্পূর্ণ লিখিত না হইতেই যন্ত্রস্থ হইল। গ্রন্থ যন্ত্রস্থ হইলে, গ্রন্থকারকে কাজে কাজেই কিছু তাড়াতাড়ি করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে হয়। এইরূপে অসংযোজিত অবস্থায় "দুর্গেশনন্দিনী" প্রথমে জনসাধারণ্যে প্রকাশিত হইল।

"দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইলে, অধিকাংশ সমালোচক গ্রন্থকারকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। বঙ্কিম বাবু চিরদিনই পাঠক, সমালোচকবর্গ হইতে এক সোপান উচ্চে অবস্থিত। তবে, দুই একখানি কাগজে প্রশংসাও করিয়াছিল। রাজেন্দ্র বাবুর "বিবিধার্থ সংগ্রহ" তন্মধ্যে একখানি।

"দুর্গেশনন্দিনী" প্রথম বারে ৪০০ কাপি মুদ্রিত হয়। অদ্য পর্য্যন্ত ইহার ১১টি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। এই সব সংস্করণে পুস্তকখানি বহুল পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইয়াছে।

বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও সমালোচনা।

বিমলা, আয়েষা ও তিলোত্তমা।

"দুর্গেশনন্দিনী"র সমালোচ্য চরিত্র তিনটি—বিমলা, আয়েষা ও তিলোত্তমা। এ তিনটিই অতি সুন্দর, উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ চিত্র।

বিমলা—প্রণয়, বুদ্ধি আশা বিলাসিতা, চিরানন্দময়ী, রসিকা গৃহিণী ; আয়েষা—স্নেহশালিনী, জ্ঞানগম্ভীরা, প্রোজ্জ্বল মাধুরীময়ী অপূর্ব্বা তরুণী ; আর তিলোত্তমা—প্রেমময়ী কুসুমকোমলা ব্রীড়াবিনম্রা পরম রমণী নবীনা। একের সহিত প্রখর দিবাকর [illegible] সংযোজিত, মধুর মলয়-হিল্লোলাকুলিত বাসন্তীয় অপরাহ্নের পূর্ব্বভাগ ;—অপরের সহিত মেঘনির্মুক্ত শারদীয় সুধাংশুকর শোভিত আলোকময়ী যামিনীর মধ্যভাগ ;—আর তিলোত্তমার সহিত ঈষৎ মেঘাচ্ছাদিত জ্যোৎস্নাপরিব্যাপ্ত মনমোহিনী শর্ব্বরীর উষা—সম্যক্ তুলনীয়। বিমলা প্রৌঢ়া, আয়েষা যুবতী, আর তিলোত্তমা ফুটনোন্মুখ যৌবনা।

এই তিনটি চরিত্রেরই মূল উপাদান—প্রণয়। যে মানসিক বৃত্তি হইতে মানব চরিত্রের সর্ব্ব প্রধান নিয়ন্তা, যাহা সৃষ্টির মানব জ্ঞানের সঞ্চারাবধি মনুষ্যপর্য্যন্ত চির বিরত—বিমলা, আয়েষা ও তিলোত্তমা সেই যবজনের প্রণয়বৃত্তি পরমাত্মায় প্রন— যেন মনোমোহিনী বহুরূপিনী ছবির তিনটি পাত্র রূপ লইয়া গঠিত। বিমলায় সে ছবির স্থির মোহন গাম্ভীর্য্যভাব—আয়েষায় তাহার উচ্ছ্বসিত, চঞ্চলোজ্জ্বল, সুমধুর, প্রশান্তভাব—আর তিলোত্তমায় তাহার একত্রত্রয়ের উপাদানের সুন্দর সংমিশ্রণ প্রকাশিত হইয়াছে। বিমলা প্রৌঢ়া গৃহিণী—আয়েষা নিব[illegible] তরুণী, আর তিলোত্তমা সলজ্জ শিক্ষিতাশা নবীনা।

আমরা যথাক্রমে এই তিনটি রমণীর রূপ চরিত্র পাঠকবর্গ সমীপে উপস্থিত করিয়াছি।

সম্মুখে বিরাট এক বাজার মিলিয়াছে। বহু লোক তাহাতে বিকিকিনী করিতেছে। বিক্রেয় সামগ্রী অনন্ত, স্তূপে স্তূপে—স্তূপে স্তূপে ক্রেতৃবর্গের মন ভুলাইবার জন্য সাজান রহিয়াছে। কোন ক্রেতা তাহার মনোমোহন রূপে আকৃষ্ট হইয়া তদ্দিকে বাধিত হইতেছে। কিন্তু পার্শ্বে এক মহার্ঘ্য দ্রব্য, সে দিকে কেহ দৃকপাত করিতেছে না; হাটের ভিড় জমাট বাঁধিয়াছে; হাটের অন্যান্য সামগ্রী তাহার কেনা হইতেছে না। মস্তকোপরি মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড স্বীয় খর করমালায় ক্রেতৃবর্গের শরীর ঘর্ম্মাক্ত করিয়া দিতেছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। ক্রেতৃবর্গ

চলিতেছে, ফিরিতেছে, শিকারের [illegible] অগ্রহ করিতেছে; কেহবা কিনিতেছে, কেহ বা কুতূহলে এক দেখা হইতে [illegible] স্থানে ফিরিয়া যাইতেছে। সে আনন্দময় নগরীর মধ্যে কিন্তু অপ্রতিহত প্রতাপেই সমভাবে সকলেরোপরি বিরাজ করিতেছে। সেই অসংখ্য জনতা মহা কোলাহল করিয়া, সেই অদ্ভুত রঙ্গভূমিতে এক অপূর্বপূর্ব ধ্বনি করিতেছে।

এই কোলাহলময় জনতাপ-তাপিত অদ্ভুত স্থানের অনতিদূরে এক প্রকাণ্ড মহীরুহের মূলদেশে একটি রমণী বসিয়া সেই জন বিক্রয়ের অদ্ভুত ক্রীড়া পরিদর্শন করিতেছেন। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, রমণীর কপোলদেশে [illegible] সেরূপ নিরক্ষিত হয়, এখনও [illegible] সেই আপাদ-পর্যটন-ক্লান্তি শরীরে পরিস্ফুট হয়। রমণী অনাবৃতদেশে সমাসীন হইয়া [illegible] মনোযোগে সেই নাটিকা-অভিনয় লীলা খেলা পরিদর্শন করিতেছেন, আর এক একবার মৃদু মৃদু হাসিয়া [illegible] পর্যটন কথার সঙ্গে তুলনা। ক্রেতা-পরেতি ছুইটি লোকের খেলা তুলনা করিতেছেন। মুখ বড়ই আনন্দের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। সহসা সে একজন বলশালী বিকটপুরুষ আসিয়া রমণীকে [illegible] করিয়া দূরে লইয়া গেল। রমণী মহাবিপদ গ্রস্ত হইলেন। ভয়ে—আতঙ্কে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। কিন্তু সে খেলা দেখিতে সময় এত আনন্দ যে, ঐ অবস্থায় পতিত হইয়াও যাইবার সময়ে রমণী সেই দৃশ্যের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। ক্ষণকাল পরে দেখিলাম কৌশলক্রমে রমণী সেই বিকট পুরুষের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আবার সেই স্থানে সমাগত হইলেন। কিন্তু এখন আর তথায় সে রূপও নাই সে ছায়াও নাই; সে সেই [illegible] [illegible] ফেলিয়া দিয়াছে। এবার তাঁহার মুখশ্রী বড়ই গম্ভীর—বড়ই বিষণ্ণ। সুন্দরী বিপদজালে জড়িত; তথাপি, তিনি সেই বীথিকার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়াই রহিয়াছেন। হঠাৎ ক্ষণকালের জন্য সে মুখখানিতে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল, সে গম্ভীর বিষণ্ণ শ্রী আনন্দময়ী হইয়া উঠিল। তার পর আর সে রমণীকে দেখা গেল না।

পাঠক, ইনিই আমাদের বিমলা। বিমলা কখন প্রেমের হাতে বিকিকিনী করিয়াছেন, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখি নাই; গ্রন্থকার তাহা বলিয়া দিয়াছেন। বীরেন্দ্রসিংহের সহিত বিমলার প্রণয়ের সঞ্চার, কি[illegible] বিমলার প্রৌঢ়-চরিত্র দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে পারি সত্য, কিন্তু গ্রন্থকার তাহা আমাদিগকে মুখে বলা ভিন্ন বিশদ করিয়া দেখান নাই। আমরা যখন বিমলাকে দেখিলাম, তখন বিমলা ঐ ছায়ায় বসিয়া প্রেমের হাটের ক্রীড়াই দেখিতেছিলেন। তখন বিমলার বিকিকিনী সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিমলা সেই রঙ্গভূমির অভিনেতৃবর্গের অদ্ভুত ক্রীড়ার সহিত স্বীয় গত জীবনের ক্রীড়ার তুলনা করিয়া, হাসিতেছেন ও ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিতেছেন। জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রেমলীলার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বিমলা সঞ্জীবিতা। দেখিতে দেখিতে

কতলু খাঁ বিমলাকে বীরেন্দ্রসিংহের ছায়া হইতে অপহরণ করিয়া লইল। বিমলা কিছু-কালের জন্য আবার নিজের কার্য্যে হতাশ হইলেন। কিন্তু সে অল্প সময়ের জন্য। ক্ষণ পরেই বিমলা আবার সেই অদ্ভুত রঙ্গভূমিতে সমাগত হইয়া জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু এবার সেরূপ আনন্দ নাই, সেরূপ হাসি নাই। জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার পরিণয়ে বিমলার মুখে বিজলী অবশ্যই খেলিয়াছিল, কিন্তু সে সব কথা আমরা কিছুই জানিতে পারিলাম না। বিমলা সেই আনন্দের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া গেলেন।

বিমলার এই স্বার্থ-বিমুক্তি ভাব বড়ই সুন্দর। তিলোত্তমা ও আয়েষা আপনার লইয়া ব্যস্ত; বিমলা পর লইয়া ব্যস্ত। বিমলার এরূপ চিত্র অস্বাধীন—স্বাভাবিকও বটে। একে তরঙ্গময় যৌবনকাল অতীত-প্রায় হইয়াছে, তার পর আবার বীরেন্দ্রের সহিত তাঁহার অদ্ভুত সম্বন্ধ। বিমলা বিধবার ন্যায় পরের সুখ লইয়াই ত থাকিবেন। কিন্তু বিধবারও অন্তর প্রদেশে—লুক্কায়িত ভাবে স্বীয় সুখের আকাঙ্ক্ষা-স্রোত তীব্রভাবে প্রবাহিত থাকিত—বিমলার তাহাও ছিল না। স্রোত অনেক দিন স্থির হইয়া গিয়াছিল। তখন বিমলার মনে কেবল তুলনা ভিন্ন আর কিছুই উঠিত না।

বিমলার বচন চাতুরী, বিমলার অন্তর্দর্শী বুদ্ধি, বিমলার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিমলার রসালাপ-পটুতা, বিমলার সাহস—"দুর্গেশনন্দিনীর" পাঠকবৃন্দের নিকট বড়ই মনোহর অনুভব হয়। এ সকলের বিশেষ বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তবে, বিমলার রসিকতা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছে। বিমলা সৌরভী; কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাকে কিছু নীচ জাতীয় রসিকতায় ব্যাপৃত দেখা গিয়াছে। এটা কি তবে বিমলার কলঙ্ক? বিমলা যেরূপ ভাবে দিগ্‌গজ-হরণ করিয়া লইয়াছিলেন, যেরূপ ভাবে সেই হরিণের সহিত রসালাপ করিয়াছিলেন, যেরূপ ভাবে কতলু খাঁকে বিমোহিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা অন্তঃপুরচারিণীর পক্ষে একটু অসঙ্গত নয় কি? এই দুইটি কথার উত্তরে আমাদিগকে দুই এক কথা বলিতে হইবে।

প্রথমে বিমলার পূর্ব্ব-পরিচয় স্মরণ করিতে হইবে। বিমলার পূর্ব্ব-পরিচয়ে আমরা বিমলাকে বড় একটা [illegible] রক্ষিতা দেখিতে পাই না। বিমলা বাল্যকালে কতকটা স্বাধীন ভাবেই ছিলেন। এই স্বাধীনতার ফলে তাঁহার বুদ্ধি সাহস, চতুরতা প্রভৃতি কতকগুলি বৃত্তির বিশেষ বিকাশ হইয়াছিল। রসালাপের ক্ষমতা সকলের থাকে না। ইহা খানিকটা লোকের মৌলিক বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। বিমলারও এই মৌলিক ক্ষমতাটি স্বাধীনভাবে যথেচ্ছা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। যৌবন কালের কথা জানি না—প্রৌঢ় বয়সে বিমলা এই ক্ষমতাটি দ্বারা দুই একবার স্বার্থসাধনও করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার ব্যবহারে আমরা কুরুচি দেখিতে পাই; বিমলা তাহা দেখিতে পাইতেন না; তাহার কারণ অনেক। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে, ইন্দ্রিয়ের উপর যাহাদের মনের আধিপত্য জন্মিয়াছে, ইন্দ্রিয়ের আকর্ষিণী শক্তি

তাহাদের নিকট বড়ই আমোদের ও কৌতুকের জিনিস। আমরা যেমন ইহাতে ভয় পাই, তাহারা ইহাতে সেরূপ ভয় পায় না, বরং আবশ্যক হইলে, তোমার আমার মত লোককে ভয় দেখাইয়া, ইহারা সেই শক্তির ক্ষমতা দেখিয়া আনন্দ লাভ করে। এরূপ অবস্থায় যখন সে শক্তি দ্বারা অন্যকে অভিভূত করিতে পারিলে, কোন কর্তব্য কার্য্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকে, তখন তাহারা সে শক্তি প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ হইবে কেন? বিমলা নিজ রূপ বা রসিকতার ক্ষমতা জানিতেন, কিন্তু এ ক্ষমতা তাঁহার মনের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিত না। আবশ্যক মত তিনিই বরং ইহার উপর কর্তৃত্ব করিয়া ইহা দ্বারা কার্য্য [illegible]ইতেন। এখন লোকের সুরুচিই বা কি, আর কুরুচিই বা কি? এই সব কার্য্যে বাহ্যিক ক্রিয়ার সহিত ইহাদের অন্তরের মিলন থাকে না।

বিমলার চরিত্রের অন্যান্য দোষ গুণ অতি সহজেই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বিমলার দারুণ প্রতিহিংসা বৃত্তি ও সেই বৃত্তি চরিতার্থ জন্য তাঁহার অমানুষিক কার্য্য স্বীয় পাঠিকার নিকট কিছু পুরুষভাবব্যঞ্জক—অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। এরূপ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি যে, রমণীতে দেখা যায় না, তাহা নহে; এতদধিক বৈর-নির্য্যাতন স্পৃহা আমরা রমণীতে দেখিতে পাইতেছি। রমণীতেই বরং এই বৃত্তির বিশেষ বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। কাল সর্পিণীর ন্যায় রমণীই এ বৃত্তি হৃদয়ে পুষিয়া রাখে। এ সবই সত্য; কিন্তু বিমলার ন্যায় রমণীর পক্ষে যেন ইহা একটু অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। সেই হাসিভরা হৃদয়ে, সেই আনন্দময়ী প্রকৃতিতে, সেই পরদুঃখ-লোলুপ অন্তরে এ বিষয়ে স্থান কিছু কষ্ট-কল্পনা বোধ হইতে পারে। এতৎ-সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে হয়।

প্রথমতঃ,—বিমলা রাজপুত-রমণী। বঙ্গনারীর সাহস ও বীর্য্যের সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। রাজপুতের যুদ্ধে বা শত্রু কর্তৃক মৃত্যু সকল সময়েই ঘটিয়া থাকে; এবং প্রকৃত তেজঃসম্পন্ন রাজপুতগণ সর্ব্বদাই এই বৈর-নির্য্যাতনে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া থাকেন। পুরুষের কার্য্য অনেক সময়েই রমণীতেও অনুসরণ করে; বিমলা যে বীরেন্দ্রসিংহের পত্নী হইয়া বৈর-নির্য্যাতন-স্পৃহ হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

দ্বিতীয়তঃ,—স্বামী বা কোন প্রিয়জন অন্য কর্তৃক অবৈধ উপায়ে অন্যায়রূপে হত হইলে, সেই হত্যাকারীর উপরে বিজাতীয় ক্রোধ বাঙ্গালী রমণীরও হয়। তবে, বিমলার ন্যায় অবস্থাপন্ন চরিত্রশালিনী বঙ্গ রমণীকে সে ক্রোধ মনোমধ্যেই বিলীন করিতে হয়। অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করিয়া ক্রোধের শান্তি দুর্ব্বলা রমণীর সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু বিমলা সেরূপ রমণী নহেন। তাঁহার অপরিসীম বুদ্ধি ও সাহস তাঁহাকে সকল সময়েই অপূর্ব্ব বলে বলবতী করিয়া রাখিত। বিমলা, নিজের বুদ্ধি ও সাহস জানিতেন, তাই তাঁহার ক্রোধ প্রতিহিংসায় আনয়ন করিল ও কার্য্যক্ষেত্রে অসম সাহসিক কার্য্যে সফলকাম করিল। বিমলা চিত্রের এ ভাগও অস্বাভাবিক নহে। তবে, আমাদের বঙ্গ রমণীদের নিকট যেন

কেমন কেমন বোধ হইলেও হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ,—সতীত্ব রক্ষার জন্য বঙ্গ রমণীও এরূপ অবস্থায় অস্ত্র ধারণ করিত, কিন্তু তাহা নিজের বিরুদ্ধে। রাজপুত-রমণী তাহা পরের বিরুদ্ধে ধারিয়াছেন। ইহা জাতিগত সাহসাদির পার্থক্যগত বিভিন্ন কার্য্য মাত্র।

পাঠক, আর একটি দৃশ্য অবলোকন করুন;—

বিলাসভবন বিলাসদ্রব্যে বিভূষিত করিয়া, বিলাসিনী মণ্ডলে বসিয়া ভোগ-পরায়ণ নবাব কতলুখাঁ। চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রিয়-সুখকর ভোগেচ্ছা-প্ররোচক সামগ্রী সম্ভার সুসজ্জিত রহিয়াছে। নবাবকে বেষ্টন করিয়া রমণীগণ কেহ নাচিতেছে, কেহ গাহিতেছে, কেহ কটাক্ষ করিতেছে, কেহ প্রেমালাপ করিতেছে। সে অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী দিব্যাভরণ-শোভিতা বিলাসিনী-বৃন্দের অনির্ব্বচনীয় বিলাস চেষ্টা পাঠককে একবার কল্পনাচক্ষে দেখিতে হইবে। যদি পাঠকগণ সুরুচির অনুরোধে বারবনিতাবৃন্দের ভোগ-বিলাস প্রত্যক্ষ করিতে অস্বীকৃত হয়েন, অন্ততঃ তাঁহাদিগকে এই রূপসী-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী কুসুমবনে স্থল-পদ্মিনীবৎ বিলাসিনীর বিলাসরঙ্গ প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। ঐ দেখুন—পাঠক, রমণীর কিবা সুন্দর অঙ্গ ভঙ্গী। কিবা রসাল মধুরালাপ, কিবা মনোমোহন কটাক্ষ ক্ষেপণ! রমণীর সম্মুখে স্বর্ণ সুরার পাত্র। সুন্দরী, কতলুখাঁর পার্শ্বে বসিয়া হেম-পাত্রে সুরা ঢালিতেছে। নবাব সম্মোহন ভাবে অধীর হইয়া ঢল ঢল ভাবে সেই লাবণ্যময়ীর প্রতি ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কতলুখাঁ আজি সে রূপ পানে উন্মত্ত। একে বিবিধ বিলাস দ্রব্যে মন বিমোহিত, তাহাতে আবার সম্মোহ-বর্দ্ধিনী তীব্র সুরার মাদকতা,—কতলুখাঁ আজি অধীর ও প্রমত্ত। ও আবার কি? পাঠক, শুনিতেছ, বিলাসিনী কি দিব্যস্বরে কি বিলাস-ব্যঞ্জক মধুর ধ্বনি করিল? এ যে রূপের সুধা—সুধার [illegible] হইতেও অধিকতর মাদক। শুনিয়া কতলুখাঁ ভাবিল, আহা, মরি মরি! কি সঙ্গীত রে!—সঙ্গীতের কি অপূর্ব্ব বাসনা উদ্বেলক স্বর কম্পন, সুর, তান, লয় রে!—কতলুখাঁর এখন আর কিছুই ত জীবিত নাই; কতলুখাঁর জীবিত আছে, কেবল ইন্দ্রিয়-ভোগেচ্ছা ও তৎসাধনার্থ ভোগী ইন্দ্রিয়-নিচয়। সঙ্গীতের তালে তালে সুন্দরী নাচিতেছে। কিবা সুন্দর নৃত্য-ভঙ্গী! কিবা সুন্দর অঙ্গ গঠন! কতলুখাঁর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। সে অগ্নিতে ইন্ধন-স্বরূপ ঘন ঘন সুরা সেবনে কতলুখাঁ ধৈর্য্য শূন্য হইয়া সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। বিহ্বলচিত্তে বলিতে লাগিলেন, —"তুমি কোথা প্রিয়তমে?"

পাঠক, এই রমণীকে কি চিনিতে পারিয়াছ? ওকি! সুন্দরীর দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছ কেন? চাহিয়া চাহিয়া কি মনে করিতে চেষ্টা করিতেছ? মনে করিতেছ, যেন ইহাকে আর কোথাও দেখিয়াছ—না? আচ্ছা, আমিই বলিয়া দিতেছি। আর একবার চাহিয়া দেখ দেখি,—ইহাকে বীরেন্দ্র-সিংহের দুর্গের মধ্যে দেখিয়াছ কি না।

চাহিয়া দেখ দেখি, সুন্দরী বিমলা কি না? ওকি! একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলে যে! দারুণ ঘৃণায় ক্রোধে তোমার শরীর আড়ষ্ট হইয়া পড়িল যে! তুমি বুঝি মনে করিতেছ, বিমলা বড়ই বিশ্বাসঘাতিনী—ঘোর কুলটা? তুমি বুঝি বিমলার এ কার্য্য দেখিয়া সমস্ত স্ত্রীজাতির চরিত্রে ঘৃণা প্রকাশ করিতেছ? আমাদিগের অনুরোধে তাহাও করিও না। তোমাকে আমরা বলিয়া রাখি, বিমলা কুলটা নহে,—বিশ্বাসঘাতিনী নহে,—বিমলা বীরেন্দ্রসিংহের পরমা সাধ্বী সহধর্ম্মিণী। এখন আর একবার চাহিয়া দেখ দেখি—এ রহস্য কিছু উদ্ঘাটন করিতে পার কি না? মুগ্ধের ন্যায় একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছ কেন? কিছু বুঝিতে পারিতেছ না? আচ্ছা, আমরা তোমাকে বুঝাইয়া দিব। ঐ যে বিমলার মনোমোহন বিলাস-চেষ্টা, উহার মধ্যেই বিমলার আন্তরিক নির্লিপ্ত ভাব কিছু দেখিতে পাও কি? ঐ যে বিমলার বিলাস-হাসি, উহার মধ্যেই বিমলার অন্তরে কোন আনন্দ চিহ্ন দেখিতে পাও কি? ঐ যে বিমলার বিলাস-কটাক্ষ—উহার মধ্যে বিমলার তীব্র-দৃষ্টি দেখিতে পাও কি? আর—আর ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখ দেখি, বিমলার সুন্দর বসন মধ্যে কিছু খুঁজিয়া পাও কি না? পাইলে না? আমরা বলিয়া দিতেছি—উহার মধ্যে শাণিত ছুরিকা লুক্কায়িত আছে! যেমন মনোমোহন লাবণ্যলীলার মধ্যে দারুণ প্রতিহিংসা—তেমনি নেত্র-সুখকর পরিচ্ছদ মধ্যে শাণিত ছুরিকা! অবিশ্বাস করিবে? অসম্ভব মনে করিবে? আচ্ছা, কিছু কাল অপেক্ষা কর। আর অপেক্ষা করিতে হইল না—ঐ দেখ! ঐ বিমলা আলিঙ্গনচ্ছলে কতলুখাঁর হৃদয়ে দারুণ ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল! ঐ শুন! কতলু খাঁ বিকট চীৎকার করিয়া অচেতন প্রায় হইয়া পড়িল! ঐ দেখ! বক্ষদেশ হইতে রুধির ধারা উৎসের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল! আর ঐ দেখ! দুঃশাসন-বক্ষবহির্গত রক্ত-পিপাসু ভীমসেনের ন্যায় তৎপ্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া সানন্দচিত্তে বিমলা ছুটিয়া পলাইয়া গেল। এখন বিশ্বাস হইল? এখন বিমলাকে বুঝিলে? এখন সাধ্বী স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা চেষ্টা দেখিলে? এখন রাজপুত রমণীর বৈর-নির্য্যাতন স্পৃহা দেখিলে? এখন নারীর লাবণ্যলীলার ক্ষমতা দেখিলে? এখন প্রমীলার সেই কথা মনে হয় কি?—

—"ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে!"

(৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত।)

বিমলার এই অদ্ভুত অভিনয় বিমলা চরিত্রের অন্যতর পৃষ্ঠা। ইহাতে তাহার বুদ্ধি, তাহার সাহস, তাহার সতীত্ব-তেজঃ, তাহার রাজপুত রমণীত্ব অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত করিয়া দিতেছে।

আমরা প্রথমে বিমলার এই অদ্ভুত জীবনলীলা-ক্ষেত্রের স্বার্থ-বিযুক্ত পরম পুলকিত পরিদর্শকের ভাব প্রদর্শন করিয়াছি; এখন অবস্থাধীন তাহার ঘোর স্বার্থযুক্ত পরম কঠিন হিংসা-জালা-জর্জ্জরিত অভিনেতৃ ভাব প্রদর্শন করিয়া বিমলা-চরিত্র শেষ করিলাম।

পাঠক, এখন একবার একবারে এই দুই-য়ের কল্পনা করিয়া সমগ্র বিষয়টাকে প্রত্যক্ষ করুন।

গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন,—"যেমন উদ্যান মধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনি আয়েষা।" আমরা এখন এই শতদলটির কয়েকটি মাত্র দলের সৌন্দর্য্য পাঠিকবর্গকে দেখাইতে চাহি। সে মনোমোহন শতদলের সৌন্দর্য্য কে ব্যাখ্যা করিবে!

পাঠক, ঐ রুগ্ন শয্যাশায়ী বন্দী জগৎসিংহের পালঙ্কোপরি উপবিষ্টা শক্র-নন্দিনী আয়েষাকে পর্য্যবলোকন কর। আমরা তোমাকে আয়েষার ঐ ভুবন-মোহন রূপ দেখিতে বলিতেছি না, পিতার পরম বৈরী বন্দী রাজকুমারের প্রতি তাঁহার ব্যবহার দেখিতে বলি-তেছি। আয়েষা কি করিতেছেন? রাজনন্দিনী নবাবপুত্রী পালঙ্কে বসিয়া স্বহস্তে কুমারকে ব্যজন করিতেছেন। আবশ্যক মত ঔষধাদি স্বীয় হস্তে প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইতেছেন। জগৎ-সিংহের আজি ব্যারাম বৃদ্ধি পাইয়াছে। আয়েষা সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। চিকিৎসক বলিলেন,—সেই রাত্রেই জ্বর ত্যাগের সময়ে জগৎসিংহের মৃত্যু ঘটি-বার সম্ভাবনা। জ্বর বিশ্রামের সময় আগত—আয়েষার বক্ষঃস্থলে হৃৎপিণ্ড বারবার আঘাত করিতে লাগিল, চক্ষু-দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল, যেন অবকাশ নাই বলিয়াই ছুটিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে চিকিৎসক বলিলেন,—"রাজপুত্র রক্ষা পাইলেন।" আয়েষার মুখশ্রী প্রফুল্ল হইল। এই রোগীর শুশ্রূষাই নিদারুণ যাতনা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিল।

আহা মরি মরি! কি সুন্দরী দয়া-ময়ী রমণী রে! নিষ্ঠুর কতলুখার গৃহে কিবা স্নেহের প্রতিমূর্ত্তি রে! কণ্টক সমাচ্ছন্ন মৃণালোপরি কিবা অপরূপ শত-দল রে!

এ হেন আয়েষাকে বুঝিতে হইলে, ঐ জগৎসিংহের অবস্থায় নিজেকে কল্পনা করিতে হইবে; আর ঐ জগৎসিংহের মত পীড়ার মোহে অভিভূত হইতে হইবে; তাহা হইলে ঐ জগৎসিংহের মত স্বপ্নে আয়েষার প্রকৃত রূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে; তাহা হইলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে, আয়েষা স্নেহমায়ায় গঠিতা স্বর্গীয়া দেবকন্যা।

নবপ্রসূতি নবজাত কন্যা কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। পার্শ্বে তাঁহার আর একটি ক্ষুদ্র কন্যা দাঁড়াইয়া রহি-য়াছে। অগ্রজা কন্যাটি সেই নবজাত শিশুকে মাতার স্নেহভাগিনী দেখিয়া মনঃপীড়ায় বড়ই কাতরা হইতেছে। মাতৃক্রোড়েই সে কনিষ্ঠা ভগিনীকে সুযোগ মতে দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিল চড় মারিতেছে, তাহার কেশ ধরিয়া দুই একবার জোরে টানিতেও ভুলিতেছে না। সমস্নেহ-ভাগিনীর এই বিদ্বেষ-ভাব পাঠক অবশ্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছ; প্রত্যক্ষ করিয়া ইহা নিষ্কলা বালিকা-হৃদয়ে কিরূপে প্রবেশ লাভ করিল, তাহাও স্থির করিয়াছ। কিছুদিন পরে, আবার এই বালিকাদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। বড়টি কিছু বয়ঃস্থা হইয়াছে, তাহার ঈষৎ জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে। ঐ দেখ!

সেই কনিষ্ঠার প্রতি স্নেহভাবপূর্ণা জ্যেষ্ঠাই আজি কনিষ্ঠাকে কি ভাবে দেখিতেছে। ক্রোড়ে করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেছে। এখন আর সে দ্বেষ নাই। এখন কনিষ্ঠা কাঁদিলে, জ্যেষ্ঠা তাহাকে মাতৃক্রোড়ে সহাস্য বদনে অর্পণ করে। এই জ্যেষ্ঠার ক্রোড়ে কনিষ্ঠা অপূর্ব্ব সুন্দর নয় কি? এই রূপই সুন্দর, আর একটি তোমাকে দেখাইব। পাঠক, একবার এ দিকে আগমন কর।

বিমলাপ্রদত্ত অঙ্গুরীয় লইয়া তিলোত্তমা জগৎসিংহের নিকট আগমন করিয়াছেন। আসিয়া, রাজকুমারের আচরণে মর্ম্মাহত হইয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। কারাগারে এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া, জগৎসিংহ আ[illegible] বাকে সম্বাদ দিয়াছেন। সম্বাদ পাইয়া সাক্ষাৎ দয়ারূপিনী আয়েষা অপ্সরার ন্যায় তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। উপস্থিত হইয়া, তিলোত্তমার অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াই, তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছেন। ঠিক্ একই রকম দেখিতে নয় কি? ঐ জ্যেষ্ঠার ক্রোড়ে কনিষ্ঠা, আর, এই আয়েষার ক্রোড়ে তিলোত্তমা দেখিতে ঠিক একই রকম নয় কি? গ্রন্থকার ঐ জগৎসিংহের একান্ত অনুরাগিনী আয়েষার ক্রোড়ে তিলোত্তমাকে অর্পণ করিয়া আমাদিগকে আয়েষার কি মনোহর চিত্রই দেখাইয়াছেন। দেখিয়া, আমরা মুগ্ধ হইয়াছি ও সত্য সত্যই পূর্ব্বের কথিত দৃশ্য স্মরণ করিয়াছি।

পাঠক, কখন ভাগীরথীতে বা অন্য কোন নদীতে বাণ আসিতে দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, তখন একবার সে দৃশ্য কল্পনা কর। স্রোতস্বিনীর সেই অপূর্ব্ব স্থিরভাব, সেই প্রশান্ত সমতল সলিলরাশি দেখিয়া, কে বুঝিতে পারে যে ইহার ভাবান্তর আছে। দেখিতে দেখিতে তীরের ন্যায় সলিল-প্রবাহ সে প্রশান্ত স্রোতস্বিনীর বক্ষ ছাপিয়া ফেলে, দেখিতে দেখিতে সে স্থিরা কল্লোলিনী গভীর গর্জ্জনময়ী হইয়া উঠে; কিন্তু আবার দেখিতে দেখিতেই তরঙ্গিণীর সে তরঙ্গায়িত ভাব বিদূরীত হয়, দেখিতে দেখিতেই সে গম্ভীর গর্জ্জন বিলীন হইয়া যায়, আবার যে স্রোতস্বিনী, সেই স্রোতস্বিনীই থাকে; তবে পরিবর্ত্তনের মধ্যে এই হয় যে, পূর্ব্বে যাহা স্বল্পতোয়া ছিল, এখন তাহা পূর্ণতোয়া হইয়া পড়ে। বিদ্যুতের ন্যায় সে [illegible] অত্যাল্প [illegible] অন্তর্হিত হয়, কেবল মাত্র সেই [illegible] চিরস্থায়ী থাকে।

এ দিকে দেখ—স্বর্গীয় দেবকন্যার ন্যায় আয়েষা রাত্রি দিন জগৎসিংহের শুশ্রূষা করিতেছেন। আমরা তাঁহার স্বর্গীয় দয়া দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতেছি। দয়া ভিন্ন রাজকুমারীর অন্য কোন ভাব আমরা দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু সহসা আজি এ কি শুনিলাম! রাত্রি কিছু অধিক হইয়াছে। আয়েষা তিলোত্তমাকে রাখিয়া আসিয়া, রাজকুমারের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিবার প্রস্তাবে আমরা বিস্মিত চিত্তে আয়েষার কথা ভাবিতেছি, এমত সময়ে ওস্মান তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"নবাবপুত্রি! এ উত্তম?" আয়েষা মুহূর্ত্তমাত্র বিচলিত

হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি উত্তম ওস্মান?" ঈষৎ রোষপূর্ণ, ঈষৎ ব্যঙ্গ স্বরে ওসমান আয়েষাকে বলিলেন,—"নিশীথে একাকিনী বন্দি-সহবাস, নবাবপুত্রীর পক্ষে উত্তম!" আয়েষা কহিলেন,—"এ নিশীথে একাকিনী কারাগার মধ্যে আসিয়া এই বন্দীর সহিত আলাপ করা, আমার ইচ্ছা। আমার কর্ম্ম উত্তম কি অধম, সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।" ওস্মান বিস্মিত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—"প্রয়োজন আছে কি না, কাল প্রাতে নবাবের মুখে শুনিবে।" আয়েষা পূর্ব্ববৎ কহিলেন,—"যখন পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তখন তাহার উত্তর দিব, তোমার চিন্তা নাই।" ওস্মান পূর্ব্ববৎ ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন,—"আর যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি?"

আয়েষা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্ববৎ স্থিরদৃষ্টিতে ওস্মানের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার বিশাল লোচন আরও রঞ্জিতায়তন হইয়া উঠিল। মুখপদ্ম যেন অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। ভ্রমরকৃষ্ণ অলকাবলীর সহিত শিরোদেশ ঈষৎ এক দিকে হেলিল, হৃদয় তরঙ্গান্দোলিত নিবিড় শৈবালদলবৎ উৎকম্পিত হইতে লাগিল। অতি পরিষ্কার স্বরে আয়েষা কহিলেন,—"ওস্মান, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই যে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!" কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া আয়েষা কাঁদিতে লাগিলেন,—"শুন ওস্মান, আবার বলি, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর,—যাবজ্জীবন অন্য কেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। কাল যদি বধ্যভূমি ইহার শোণিতে আর্দ্র হয়"—বলিতে বলিতে আয়েষা শিহরিয়া উঠিলেন; "তথাপি দেখিবে, হৃদয়মন্দিরে ইহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্তকাল পর্য্যন্ত ইহার আরাধনা করিব। এই মুহূর্ত্তের পর যদি আর চিরন্তন ইহার সঙ্গে দেখা না হয়, কাল যদি ইনি মুক্ত হইয়া শত মহিলার মধ্যবর্ত্তী হন, আয়েষার নামে ধিক্কার করেন; তথাপি, আমি ইহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী দাসী রহিব।" ইত্যাদি কথাগুলি বলিয়া আয়েষা আবার অশ্রুজল মুছিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া অন্য প্রকার স্বরে কহিতে লাগিলেন,—"ওসমান, এ সকল কথা বলিয়া তোমাকে ক্লেশ দিতেছি, অপরাধ ক্ষমা কর" ইত্যাদি। পরে, জগৎসিংহের দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"রাজপুত্র, তুমিও অপরাধ ক্ষমা কর। যদি ওস্মান আজ আমাকে মনঃপীড়িত না করিতেন, তবে এ দগ্ধ হৃদয়ের তাপ কখনও তোমার নিকট প্রকাশ পাইত না, কখনও মনুষ্য-কর্ণ-গোচর হইত না।" আয়েষা আবার বলিতে লাগিলেন,—"ওসমান, আবার বলি, যদি দোষ করিয়া থাকি, দোষ মার্জ্জনা করিও। আমি তোমার পূর্ব্বমত স্নেহ-পরায়ণা ভগিনী; ভগিনী বলিয়া তুমিও পূর্ব্বস্নেহের লাঘব করিও না। কপালের দোষে সন্তাপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি; ভ্রাতৃস্নেহে নৈরাশ করিয়া আমায় অতল জলে ডুবাইও না।"

পাঠক, এখন দেখ দেখি, ঐ স্রোতস্বিনীর খর প্রবাহের সহিত আয়েষার এই উচ্ছ্বাসময়ী বাক্যাবলী তুলনীয় নয়

কি? আর ঐ স্রোতস্বিনীর পূর্ব্ব ভাবের সহিত আয়েষার ধীর গতি প্রেমস্রোত ও তাহার পরবর্ত্তী ভাবের সহিত এই আয়েষার উচ্ছ্বাস ভাবোত্তীর্ণ ওস্মান প্রতি হৃদয়ে স্নেহপ্রীতি ভাব তুলনীয় নয় কি? ঠিক তুলনীয়।

ভাল ত অনেকেই বাসে। জগৎসিংহের প্রতি আয়েষা অনুরাগিণী হইয়াছেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। অবস্থাধীনতায় তাহা সম্ভব বটে, ক্ষুদ্র কবির হস্তেও আয়েষা ঐরূপ ভাব প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু প্রকৃত কবির কার্য্য, ঐ স্রোতস্বিনীর খর প্রবাহ প্রদর্শনে। বিদ্যুতের ন্যায় সে প্রবাহ ক্ষণকালের জন্য আয়েষার অন্তর দেখাইয়াই মিলাইয়া গেল। আমরা তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত, বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। সে মেঘ অপসারিত হইবামাত্র আবার দেখিলাম, যে আয়েষা সেই আয়েষা! প্রভেদমাত্র আয়েষা এখন স্নেহকাতরা অশ্রুপূর্ণা। আয়েষার এ স্বপ্নময় উচ্ছ্বাস কাব্যামোদী পাঠকবর্গের নিকটে বড়ই সুখকর ও প্রীতিজনক। আয়েষার উচ্ছ্বসিত বাক্যাবলী আজীবন অনেকেরই হৃদয়ে থাকিবে।

ভালবাসিয়া ভালবাসা পায় নাই, এরূপ লোক জগতে সংখ্যাতীত। আমরা যাহাকে চলিত কথায় নিরাশ-প্রণয় বলি, সে প্রণয়ের ফল পৃথিবীর অনেক লোকেই আস্বাদন করিয়াছেন। কেহ বা বাল্যকালে কোন বাল্যসখীর নিকট, কেহ বা কৈশোরে কোন কিশোরীর নিকট, কেহ বা যৌবনে কোন ভামিনীর নিকট—এমন কি, প্রৌঢ় বৃদ্ধ পর্য্যন্তও অল্পাধিক এ প্রণয়ে ভুক্তভোগী হইয়াছেন। সকলেই অবগত আছেন, সুবর্ণের কষ্টি-পাথরের ন্যায় প্রণয়েরও ইহা প্রথম পরীক্ষা। এই স্থান হইতেই বিভিন্ন শ্রেণীর প্রণয় বিভিন্ন পথে ধাবিত হইতে থাকে। এই শব্দটে পড়িয়াই কেহ বা অপ্রাপণীয় প্রণয় পাত্রকে সম্যক্ বিস্মৃত হইয়া, প্রাপণীয় প্রণয় পাত্রে মনোনিবেশ করেন; কেহ বা দুর্জ্জয় অভিমান ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, মত্ত-প্রণয়-লোলুপ সেই প্রণয় পাত্রকে নির্য্যাতন করিতে অভিলাষী ও সচেষ্ট হয়েন, কেহ বা প্রতিদানে ভালবাসা না পাইয়া, চক্ষের জলে সে ভালবাসার কলঙ্কিত অংশ প্রক্ষালন করিয়া, স্বর্গীয় আনন্দে তাহার পুষ্টিসাধন করেন; কেহ বা প্রকৃত প্রণয় দেখাইতে পারিলে, অবশ্যই একদিন না একদিন অবশ্যই এই বিরূপ প্রণয় পাত্রই আমাকে ভালবাসিতে পারেন, এই আশা ও আকাঙ্ক্ষায় প্রণয়কে স্বার্থশূন্য ও নিষ্কাম প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন। কত আর লিখিব,—যেরূপ মনুষ্য অনন্ত, বোধ হয়, প্রণয়ের শ্রেণীও সেইরূপই অনন্ত। তবে, সচরাচর আমাদিগের চক্ষে যাহা পড়ে, তাহাই লিখিলাম।

যাহাকে আমরা নিরাশ-প্রণয় বলিয়া অভিহিত করি, বাস্তবিক তাহা "নিরাশ" বিশেষণের যোগ্য কি না, তদ্বিষয়ে আমাদিগের ঘোর সন্দেহ আছে। একেবারে মিলনের আশা—কি ঐহিক, কি পারত্রিক, কোন কালেই কোন প্রকারেই মিলনের আশা না থাকিলে, সে প্রণয় স্থায়ী থাকিতে পারে, এরূপ সংস্কার এখনও আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। এরূপ প্রণয়ীর কার্য্যকলাপ স্থূল দৃষ্টিতে

দেখিলে, একেবারেই কামনা-শূন্য বলিয়া অনেক স্থলে অনুমিত হয় সত্য ; কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিলে, সেই প্রণয়িগণের অন্তর মধ্যে এরূপ একটি প্রচ্ছন্ন ভাব দেখিতে পাই, যাহাতে কিঞ্চিৎ কামনার অংশ আছে, হয় ত প্রণয়ী তাহা জানে না। এ কথা বুঝাইতে অনেক [illegible] না লিখিয়াও থাকিতে পারা গেল না। এরূপ সুযোগ ছাড়িতে নাই।

আমরা জানি, অনেক নিষ্কাম-প্রণয়ী নিজের [illegible] কার্য্যে [illegible] পাঠককে বলিয়া থাকে,—"দেখ, দেখ, আমার এই প্রণয় কেমন উচ্চ! কেমন পবিত্র! কেমন প্রগাঢ়! এই প্রণয় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ?" যেরূপ কাব্যের কথা বলিত হইয়াছে, বাস্তবিকই সে কার্য্য অন্যের পক্ষে কষ্টদায়ক। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? সে কার্য্য ও প্রদর্শনের জন্য—যাহার কারণ ও পরিষ্কার, তাহাকে নিষ্কাম বলিব কিরূপে?

নিষ্কাম ভালবাসা আছে, স্বীকার করি। কিন্তু একবার যাহার ভালবাসার মূলে কামনা ছিল, প্রতিদানের আশা ছিল, তাহার প্রণয় প্রতিদান না পাইয়া যে নিষ্কাম ও স্থায়ী থাকিতে পারে, এরূপ বিশ্বাস আমাদের নাই। এরূপ ভালবাসা সময়ে পুষ্ট হয়, তাহাও স্বীকার করি; এরূপ ভালবাসায় জগতের অনেক অসাধ্য ব্যাপারেও সাধন করিতে পারে ও করিয়া থাকে। তাহাও স্বীকার করি। কিন্তু সে ভালবাসা [illegible] আশাশূন্য ও কামনাশূন্য হইয়া স্থায়ী থাকিতে পারে, এরূপ কথা স্বীকার করি না। বিরহে প্রণয়ের পুষ্টি বটে, কিন্তু কোন প্রকারের মিলনাশা-শূন্য চিরবিরহ বুঝি প্রণয়ের বিনাশ সাধন করে।

চলিত কথায় এই নিষ্কাম-প্রণয়ী আমরা চরিত্রের উচ্চম অরূপ। এক প্রকার প্রণয়ী প্রতিদান একেবারে আকাঙ্ক্ষা করিয়া, ও আকাঙ্ক্ষা পরে নিষ্কাম দিয়াছে, [illegible] তাহাদের কবি [illegible] প্রণয় [illegible] ছেন যে, তিনি কোন বিনিময় প্রণয়িনীর ভালবাসা আশা করেন নাই। এ কথা সত্য হইলে, তাঁহাদের প্রণয় বাস্তবিক নিরাশ প্রণয় নহে; কথায় মাত্র নিরাশ প্রণয়। কিন্তু আমরা প্রণয়ীর কথা সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে চাহি না। তাঁহারা একান্ত সত্যপ্রিয় হইলেও সময়ে দুই এক সময়ে ঘোর মিথ্যাবাদী হইয়া থাকেন। ইচ্ছা করিয়া তাঁহারা এ মিথ্যা কথা বলেন না—ইহা প্রণয়ের অদ্ভুত প্রতারণা। আমরা জগৎসিংহের নিকটে পত্র বাহির [illegible], প্রথম পত্রকে সুখ দুঃখ একেবারে জগদীশ্বর চরণে সমর্পণ করিয়া থাকিলে, পত্র লেখার সময় "প্রাণাধিক" শব্দ কাটিয়া দেখিতে কত ব্যথা পাইবেন কেন? আর পরিণামে গঙ্গাস্বরূপই বা পবিত্রের জন্য বিসর্জ্জন করিতে হইবে কেন?

কিন্তু আবার এ কথা সত্য বলিয়া না গ্রহণ করিলেই বা ক্ষতি কি? নিষ্কাম প্রণয় যাহার পরীক্ষাস্থল উত্তীর্ণ হইয়া বর্তমান ও স্থায়ী থাকে, তাঁহার প্রণয় সেই প্রণয়ে পরিপুত হইয়া যায়। থাকুক তাঁহার কামনা, থাকুক তাঁহাতে কিছু

[illegible] থাকুক [illegible] প্রদর্শন ভিন্ন — সে প্রণয় তিল হইতে অন্য হইবে — [illegible] প্রণয়ীকে শীতল করিবেই। সে প্রণয়ীর [illegible] মন্দাকিনী প্রবাহ [illegible] [illegible] পবিত্র [illegible] থাকিবে। আয়ে- ষার প্রাণে আয়েষার অজ্ঞাত কোন বাসনার ছায়া অনুমান করিয়া লইলেও, [illegible] আয়েষা চরিত্র কলঙ্কিত [illegible] [illegible] [illegible] চিত্তশুদ্ধি [illegible] নিরাশ-প্রণয় [illegible] করিতে পারিয়া, তাঁহার অন্তরে [illegible] আত্মপ্রসাদ জন্মিয়াছিল যে, [illegible] আর কোন সুখই [illegible] [illegible] ঘৃণা করিতেন। [illegible] [illegible] পারিলেও সুখ। কাঁদিতে পারিলেও সুখ। আয়েষার ন্যায় সুখী এ জগতে কয়জন দেখিতে পাও?

ওসমান প্রতি আয়েষার মধুর ব্যব- হার, আয়েষার নিরাশ প্রণয়ের একটি [illegible]। নিরাশ প্রণয়ীর ন্যায় সহানুভাবের আর কি জগতে আছে? [illegible] আয়েষাকে ভাল বাসিয়া [illegible] যন্ত্রণা পাইতেন, তাহা আয়েষা জানি- তেন, তাই, আয়েষা ওসমানের প্রতি বড়ই স্নেহশীলা, বড়ই করুণাময়ী। সাধ্য মতে ওসমানকে ক্লেশ দিতে আয়েষা অনিচ্ছুক—তাহাতে তাঁহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইলেও ক্ষতি নাই। ওসমান ক্লেশ পাইবে বলিয়া, তিনি জগৎসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও করিতে যান নাই। এ [illegible] নহে, কিন্তু [illegible] আয়েষা তাহা করিয়াছিলেন।

[illegible] আয়েষার যেরূপ কষ্ট, [illegible] জগৎসিংহের সেইরূপ [illegible] আয়েষা বুঝিতেন। তাই এক [illegible] তিনি [illegible] ছিলেন, — "তুমি [illegible] বাপের নিকট [illegible] করিও না।"

[illegible] কেন প্রতিজ্ঞা করুন না, আয়েষা আপনাকে একটু যেন বৈরা- গিনী জ্ঞান করুন না, তথাপি তাঁহার [illegible] জগৎসিংহের সহিত তিলোত্তমার [illegible] হইয়া গেল। আয়েষা [illegible] আভরণে তিলোত্তমাকে ভূষিত করিলেন। কিন্তু [illegible] তিলোত্তমা [illegible] [illegible] করিতে লাগিলেন—আয়েষা কহিলেন, —

"ভগিনি, এ সকলের প্রশংসা করিও না। তুমি আজ যে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ সকল তাঁহার চরণরেণুর তুল্য নহে।" এই কথা বলিতে বলিতে আয়েষার চক্ষে জল আসিল; কিন্তু [illegible] কষ্টে অভাগা আয়েষা অতি ক্লেশে তাহা সংবরণ করিলেন।

অলঙ্কার পরাইয়া, আয়েষা তিলোত্তমার হাত দুইটি ধরিয়া, তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, —

"এ সরল প্রেমপ্রতিম মুখ দেখিয়া ত বোধ হয়, প্রাণেশ্বর কখন মনঃপীড়া পাই- বেন না। যদি বিধাতার অন্য রূপ ইচ্ছা না হইয়া, তবে তাঁহার চরণে এই ভিক্ষা যে, যেন ইহার দ্বারা তাঁহার চিরসুখ সম্পা- দন করেন।" তিলোত্তমাকে কহিলেন, —

"তিলোত্তমে, আমি চলিলাম। তোমার স্বামী ব্যস্ত থাকিতে পারেন,

তাঁহার নিকট বিদায় লইতে [illegible] কাল হরণ করিও না। [illegible] [illegible] বায়ু [illegible] [illegible] মিলাইয়া [illegible] পবিত্র। [illegible] তোমার [illegible] হৃদয় মধ্যে যত্নে রাখিও।”

“তোমার [illegible] বলিতে [illegible] কণ্ঠরোধ হইল [illegible] দেখিলেন, আয়েষার নয়নপল্লব [illegible] প্লাবিত হইয়া [illegible] [illegible] সমভাষিণীর ন্যায় [illegible] কাঁদিতেছ কেন [illegible] [illegible] উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতবেগে গৃহ ত্যাগ করিয়া [illegible] গোলাপরোহণ করিলেন।”

ধন্য প্রণয় তোমার [illegible] শক্তি। জগতে এমন বীর নাই যে তোমাকে জয় করিয়াছে [illegible] [illegible] করিতে পারে? যে তোমার শক্তি জানে, যে সাবধানে তোমার সহিত বিবাদে [illegible] হয়, সে না জানে, [illegible] ভাগীরথী-প্রবাহে ঐরাবতের ন্যায় তোমার [illegible] কোথায় ভাসিয়া যায়। [illegible] প্রতাপ, তোমার প্রতাপ-ভয়ে রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন করিলেন। [illegible] শৈবলিনী মহাপুরুষ কর্তৃক সমাজ [illegible] হইয়াও তোমারই অনিবার্য্য প্রতাপ [illegible] করিয়া, প্রতাপকে বলিলেন,—“তুমি আর কখন আমার সম্মুখে আসিও না। [illegible] দেখাইব।” [illegible] [illegible] কত [illegible] না করিলে [illegible] [illegible] তাহার সে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আয়েষা [illegible] [illegible] [illegible] হইল। [illegible] [illegible] তোমার [illegible]

[illegible] নাই। [illegible] হইলে কেন [illegible] তোমার শ্রীপদতলে [illegible] বিক্রয় করিলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তোমারই [illegible] [illegible] হইল।

জগৎসিংহের গৃহ হইতে [illegible] বিদায় গ্রহণ করিয়া আয়েষা [illegible] আবার গৃহে [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] রাত্রি [illegible]। আয়েষা [illegible] [illegible] [illegible] শীতল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাতায়নে বসিয়া [illegible] কোমল নীলবর্ণ গগনমণ্ডলমধ্যে [illegible] লক্ষ তারাদল জ্বলিতেছে, মৃদু-পবন-হিল্লোলে [illegible] বৃক্ষপত্রের [illegible] মুখরিত হইতেছে। দুর্গশিরে [illegible] গম্ভীর নিনাদ করিতেছে। [illegible] দুর্গ-প্রাকার-মূলে, যেখানে আয়েষা দাঁড়াইয়া আছেন, তাহারই নীচে [illegible] দুর্গপরিখা নীরবে আকাশপট-প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

“[illegible] বাতায়নে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরী উন্মোচন করিলেন। সে অঙ্গুরী গরলাধার। একবার মনে করিতেছিলেন, “এই রস পান করিলে এখনই সকল তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারি।” আবার ভাবিতেছিলেন, ‘এই কার্য্যের জন্য কি বিধাতা আমাকে সংসারে পাঠাইয়া ছিলেন? যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম, তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিলাম কেন? জগৎসিংহ শুনিলেই বা কি বলিবেন?’

[illegible] [illegible] অঙ্গুলীতে [illegible] [illegible] কি ভাবিয়া খুলিয়া লইলেন। ভাবিলেন, “এ লোভ সম্বরণ [illegible] [illegible]

[illegible] প্রকাশ [illegible] বরাই [illegible]

"এই [illegible] [illegible] [illegible] পরিবর্তন [illegible] লিখিত [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দক্ষিণ [illegible] যে [illegible] তুমি, [illegible] [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন, [illegible] এই [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] সুন্দর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র [illegible] [illegible] হৃদয়ের কি সুন্দর [illegible] হইয়াছে [illegible] [illegible] আয়েষার [illegible] [illegible] কি, জিজ্ঞাসা করিতে চাও? [illegible] আয়েষার ন্যায় [illegible] [illegible] বিস্মিত হইয়া [illegible] পারেন চিন্তায় [illegible] হও নাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ক্ষুদ্র ভাবকাব্য [illegible] একবার [illegible] একবার [illegible] তোমার [illegible] [illegible] প্রেম-[illegible] হৃদয়ে সেইরূপই সুচিন্ত্য, সুধা [illegible] হইয়াছে, [illegible] বিজী [illegible] হইয়াছে।

এদিকে, কল্‌বাত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছিল, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] প্রবাহিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

মহাকবি! তোমার পদতলে শত শত [illegible] প্রণাম!

[illegible] একস্থলে [illegible] স্বীয় [illegible] অভিপ্রায় এইরূপ [illegible] [illegible] লিখিয়াছেন,—

"[illegible] [illegible] রমণী,—প্রাণ ভরি [illegible]

[illegible] নয়নে চাঁদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইত্যাদি

মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্র [illegible] এ সাধ [illegible] পূরণ করিয়া [illegible] ছিলেন। তাঁহার তিলোত্তমা, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

তিলোত্তমা, কুন্দ, ভ্রমর ততবই [illegible] রক্তা ও [illegible]নিতত্তা পরিদৃষ্ট হয়। ইহার সকলেই "জলে বোয়া খুই হুলের মত।"

এই চরিত্র [illegible] মধ্যে "তিলোত্তমা" [illegible] এবং কনিষ্ঠা ও অপা[illegible]। তিনি [illegible] গুরু রেখা-পাত দ্বারাই তিলোত্তমার অবয়ব প্রদর্শন করিতে কবি চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা তিলোত্তমার অবয়ব ইহাতেও প্রত্যক্ষ করিলাম বটে; কিন্তু কুন্দ-ভ্রমার ন্যায় তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত রহিল না। "সন্ধ্যা-সমীরণ-কম্পিতা বাসন্তী লতার ন্যায়" স্মৃতি-মধ্যে কেবল একবার দুলিল মাত্র।

গ্রন্থকার [illegible] লেখনী দ্বারা, তিলোত্তমা তিনটি রূপে আমাদিগের [illegible] হইল। একটি তাঁহার নবীন [illegible] সঞ্চার প্রদর্শনে, একটি তাঁহার পরিত্যক্ত জগৎসিংহের নিকট কারাগারে গমন ও তথায় দুর্বাক্য কঠোর প্রত্যাখ্যাত হওয়া। আগমন সময়ে ও একটি তাঁহার সেই প্রত্যাখ্যানজনিত উৎকট মানসিক পীড়া কালে। আমরা ইহার একটি মাত্র উপস্থিত করিয়া পাঠকবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব।

জগৎসিংহের প্রতি তিলোত্তমার নবোদ্ভিন্ন প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে। তিলোত্তমা সেই প্রণয়ের মোহময়ী ছবি স্বীয় কোমল হৃদয়-পটে অঙ্কন করিতেছেন। সায়াহ্নকালে [illegible] তিলোত্তমা এ চিন্তা আরম্ভ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, [illegible] হয় নাই। তিলোত্তমা চিন্তার [illegible] উঠিলেন। [illegible] কোমল [illegible] চিন্তার [illegible] [illegible] সমর্থন না হওয়ায় [illegible] হইতে লাগিল। তিলোত্তমা [illegible] পড়িতে বসিলেন। কিন্তু [illegible] তিনি ছাড়িয়া দিলেন, [illegible] কষ্ট; কাদম্বরী [illegible] কিছুতেই মন স্থির হইল না। [illegible] গোবিন্দ আসিলেন, কিছুক্ষণ [illegible] থাকিল। তিলোত্তমার হৃদয়ে [illegible] সঞ্চার মাত্র হইয়াছে। তিলোত্তমা পড়িতে লাগিলেন,—

"সুপ্রবরীয় [illegible] কৌশিক [illegible]।"

"এই [illegible] পুস্তক নিক্ষেপ করিলেন। [illegible] নির্বাক হইয়া [illegible] ছিল [illegible] [illegible] ইত্যাদি [illegible] লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ঘাটের এক [illegible] কালীর চিহ্নে পরিপূর্ণ হইল, [illegible] জ্ঞান হয় নাই, [illegible] নিজকর্ম দেখিয়া [illegible] করিলেন, [illegible] কি লিখিয়াছেন তাহা হাসিতে হাসিতে পড়িতে লাগিলেন। [illegible] কি লিখিয়াছেন [illegible] "মহাশ্বেতা" [illegible] সেঁজুতির ফল, [illegible] "বিমলা" লতা, পাতা, [illegible] [illegible] সকল, আর কি লিখিয়াছেন?

"কুমার জগৎসিংহ।"

লজ্জায় তিলোত্তমার মুখ রক্তবর্ণ হইল।

[illegible] [illegible] [illegible] তিলোত্তমা [illegible] ভিতরে, তখন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারেন, [illegible] [illegible] [illegible] সর্বদাই [illegible] হইয়ে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ক্রীড়া করিতেছে।

এ অংশটুকু পাঠ করিতে পারক হইবে না, কেহ [illegible] দেখিতে পাইবে। [illegible] [illegible] আনিয়া লিপি [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া মনঃপূত হইল না। [illegible] [illegible] করিয়া [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চিহ্ন মাত্র নাই। [illegible] [illegible] হইল, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] আনিয়া [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কুমার জগৎসিংহ।

[illegible] বঙ্কিমের মহামুরাগ [illegible] সুন্দর চিত্রিত দেখিলাম, ও [illegible] [illegible] বালিকা-সুলভ [illegible] [illegible]— [illegible] [illegible] মধ্যে একটি মোহন [illegible] [illegible] রহিয়াছে। [illegible] মহাকবি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] মহাকবিরই [illegible] [illegible] বটে।

এখন আমরা এই কুমারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

[illegible] সুরক্ষিত, [illegible] হইতেছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না।

[illegible] এখন গ্রন্থকারের এই [illegible] [illegible] বর্ণনার সঙ্গে [illegible] [illegible] প্রকৃতি মিলাইয়া [illegible] [illegible] [illegible], চিত্রপটের [illegible] [illegible] [illegible] ভুলিয়া যাইতে পারিবে না।

অন্যান্য চরিত্রাবলী

[illegible], [illegible], [illegible] প্রভৃতি চিত্রের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। [illegible] [illegible] [illegible] মাত্র অভিরাম স্বামী ও [illegible] [illegible] সম্বন্ধেই দুই এক কথা বলিব।

প্রথমে [illegible] [illegible] [illegible] বলা [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রদর্শন করিতে [illegible] চেষ্টা করিয়া [illegible]। [illegible] মহাকবি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের কবির [illegible] ছিল কি না, জানি না। [illegible] ছিল না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অকৃত্রিম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জীবন [illegible] [illegible]

চরিত্র সৃষ্টিতে কোন চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাদের [illegible] চরিত্র মধ্যে একটি স্থির ভাবের [illegible] প্রবাহিত আছে। বোকা বামুনের চরিত্রে সে সব কিছুই নাই। দিগ্‌গজের [illegible] নাই। তাঁহাকে দেখিয়া যে হাসি পায়, সে হাসিতে প্রকৃত পক্ষে কোন [illegible] নাই। বরঞ্চ যা কিছু থাকে, তাহা অতি স্থূল ও কর্কশ। গ্রন্থকার নিজে না হাসিয়া কোন স্থানেই আমাদিগকে হাসাইতে পারেন নাই।

বিমলা, [illegible], কতলুখাঁ প্রভৃতি চরিত্রে যে [illegible] অঙ্কিত হয়, তাহাই খাঁটি জিনিস। গ্রন্থকার বোধ হয়, ইহা বুঝিতে পারিয়া [illegible] কোন স্থানেই গজপতির মত চরিত্রের অবতারণা করেন নাই। [illegible] গজপতি যে টুকু আমাদিগকে হাসাইয়াছে, সে কেবল [illegible] মাত্র। বিমলা, আসমানি প্রভৃতিই এ জন্য [illegible]।

বঙ্কিম বাবু প্রায় [illegible] এক প্রকারের সন্ন্যাসী বা [illegible] অঙ্কিত হয়, এই সন্ন্যাসিগণ [illegible] জ্ঞানী ও ধর্মশীল। ইহাদিগের [illegible] গ্রন্থকার তাঁহার কয়েকটি অতি উজ্জ্বল [illegible] গঠিত করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু [illegible] ভাবে [illegible] ইহাদিগের চরিত্রে, প্রথমে তিনি [illegible] [illegible] নাই। এ সংসারে [illegible] আছে, সন্ন্যাসীও আছে। কবির নিকট উভয়ই [illegible]। বঙ্কিম বাবুর সব সন্ন্যাসীই সুন্দর ও অকৃত্রিম। [illegible] [illegible] [illegible] তেমনি সন্ন্যাসীও

[illegible] আছে। কিন্তু [illegible] [illegible] না [illegible] কপালকুণ্ডলায় [illegible] নহে, [illegible] মাত্র।

"দুর্গেশনন্দিনী"র অভিরাম স্বামী এই প্রথম [illegible] সন্ন্যাসী। [illegible] এই অভিরামই বঙ্কিম বাবুর অন্য গ্রন্থে [illegible] ধর্ম-সেবী পরম যোগিগণ প্রাপ্ত [illegible] [illegible] সন্ন্যাসীদের প্রতি [illegible] [illegible] কবির মনে এই [illegible] [illegible] অভিরাম [illegible] [illegible] সন্ন্যাসীদের [illegible] একটী [illegible] চরিত্রে [illegible] তাহারাও [illegible] আছে [illegible] [illegible]।

বিবিধ।

"দুর্গেশনন্দিনী"র [illegible] একটী কথা আমরা [illegible] [illegible] "আই[illegible] ভানহো" নামক উপন্যাসের [illegible] ও "রেবেকা" চিত্র হইতে এই চিত্র দুইটি গ্রহণ করিয়াছেন—[illegible] সাধারণের ধারণা। এই কথা [illegible] একজন শিক্ষিত [illegible] বঙ্কিম বাবুর [illegible] করিতে [illegible] [illegible] এ কথাটি [illegible] এক [illegible] করিলা।

এ কথা সত্য হইতে পারে, [illegible] [illegible] বিভিন্ন [illegible] [illegible] এ কথা [illegible] হইলেই [illegible]

[illegible] তাঁহাতে তাঁহাকে [illegible] [illegible] ঐতিহাসিক উপন্যাসের জনক, "কপালকুণ্ডলা" প্রভৃতি [illegible] উপন্যাস [illegible], তরুণ বয়সে যদি [illegible] [illegible] ছিলেন [illegible] হইয়া যখন পাঠকদিগকে তাঁহার উপহার দিয়া থাকেন, অথচ তাহার [illegible] কোন [illegible] নয়। একথা নহে। [illegible] তাঁহারই [illegible] করা রিখনিলুকেরই [illegible] [illegible]

কিন্তু কথাটি [illegible] নহে। [illegible] [illegible] এই কারণে মনে হয়;—

একবার আমাদিগকে [illegible] বলিয়াছেন যে, "[illegible]" হইতে [illegible] [illegible] [illegible] যেহেতু তিনি "[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমরা [illegible] এ কথা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিলম্ব [illegible] [illegible] তাহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোনও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যদি [illegible] যায় [illegible] উক্ত চরিত্রের [illegible] ভাবে [illegible] হইতে গৃহীত [illegible] আমরা বলিব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible]

[illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] যে ইংরাজী হইতে তিনি [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ [illegible] নাই? [illegible] তরুণ বয়সে ইংরাজী হইতে কিছু গ্রহণ করিলে, তাহা স্বীকার করিতে বঙ্কিম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?

আমরা পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] মহাশয়ের নিকটও এ বিষয়ের [illegible] মীমাংসা প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন,—"বঙ্কিম বাবুর [illegible] বিষয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিতে পারিতেন এবং তিনি সর্ব্বদা এইরূপ [illegible] করিয়া বালকদিগের [illegible] করিতে ভাল বাসিতেন। [illegible] [illegible] [illegible] বর্ণিত হইয়াছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একরূপ [illegible] কাহিনী [illegible] নিকট [illegible] করিয়া থাকিবেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহারই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকিবেন।

এরূপ ঘটনাও আশ্চর্য্য নহে। [illegible] [illegible] বিরুদ্ধবাদীরা দুই একটি আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন। "দুর্গেশনন্দিনী" [illegible] অনুকরণ, [illegible] এই কথা বলিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইতে চাহেন না; তাহা হইলে এই খানেই নিরস্ত হইতে তাঁহাদের কোন [illegible] থাকিত না। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছাপূর্ব্বকই [illegible] [illegible] [illegible] চরিত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] এবং তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

মিথ্যা কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। একণে যাঁহাদের মত, তাঁহারা কি বলেন? এই সমগ্র সাদৃশ্যের বা নিবন্ধ লক্ষিত হয় কেন? তাঁহারা বলেন,—যদি অন্যান্য লোকের কথাই সত্য হইত, তবে উপন্যাসদ্বয়ের ঘটনাগুলিই এক হইবার সম্ভাবনা ছিল; অধিক হইলে, চরিত্রের মূল উপাদানই এক হইবার সম্ভাবনা ছিল; ঠিক কথাগুলি দুই গ্রন্থে এক হইল কিরূপে?

কথা গুলি যে দুই এক স্থানে একরূপ হইয়াছে ইহা আমরা সকলেই দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু কথা এই যে, বিভিন্ন গ্রন্থকারের এইরূপ চিত্রিত চরিত্রের অভিন্ন রূপ হওয়া কি অসম্ভব? অন্যত্র ইহার কি নিদর্শন নাই?

আছে বৈ কি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাদি তুলনা করিলে, ভাবের, উপমার, এমন কি, চিত্রিত চরিত্রেরও সাদৃশ্য দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এ সকল কি এক অন্যের অনুকরণে বা অনুবাদে হইয়াছে? আর এরূপ ভাবাদি এক প্রকার হওয়াই ত সম্ভব। মানব মন সর্ব্বত্রই ত একরূপ। প্রেমাদি প্রবৃত্তি ত সর্ব্বত্রই প্রায় একইরূপে মানব হৃদয়ে বিরাজ করে। কেবল বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন বিষয়াদির জন্য কিছু একটু বিভিন্নতা হয়। তাহাতে সকল সময়ে নহে। যে সম্বন্ধে সামাজিক নিয়মও বিরুদ্ধ থাকে না, সে সম্বন্ধে বিভিন্নতার কারণ কি হইতে পারে? "ভগিনি! এ সকলের প্রশংসা করিও না। তুমি আজ যে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ সকল তাহার চরণ রেণুর তুল্য নহে।" ইত্যাদি কথা একরূপ স্থলে লোকে সহজেই সব কহিতে লিখিতে পারেন। এইরূপ তর্কের উপর নির্ভর করিয়া বঙ্কিম বাবুর ন্যায় একটি লোককে মিথ্যাবাদী বিশ্বাস করা কি উচিত?

কাদম্বরী উল্লেখের পর বঙ্কিম বাবু অনেক বাগ্ করিয়া লোকে ... আমরা কিন্তু বরাবরই বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু কোন উদ্দেশ্য ভিন্ন বঙ্কিম বাবু কোন গ্রন্থই প্রায় প্রণয়ন করেন নাই। "দুর্গেশনন্দিনী"র সে রকম কোন একটী উদ্দেশ্য আপাততঃ চক্ষে পরিলক্ষিত হয় না সত্য, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য কিছু ভিন্ন প্রকার। আমরা তাহা নিম্নে নিবেদন করিতেছি —

বঙ্কিম বাবু যখন "দুর্গেশনন্দিনী" প্রণয়ন করেন, তখন বাঙ্গালা গ্রন্থের পাঠক ছিল না। পাঠক সংগ্রহ করাই "দুর্গেশনন্দিনী" প্রণয়নের প্রথম উদ্দেশ্য। তাঁহার যাহা কিছু বলিবার, তাহা কাহার নিকট বলিবেন? একজন শ্রোতা চাই, নতুবা সে বলায় ফল নাই। ইংরাজী ভাষায় বলিলে, সে কথা দেশের সাধারণে প্রচার হইবে না, তাই বাঙ্গালী কবি বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় উপন্যাস লিখিয়া বাঙ্গালার পাঠক সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

বাঙ্গালা গ্রন্থের পাঠক সংগ্রহ করিয়া ভাষার পুষ্টি সাধন ও তদ্বারা দেশের উন্নতি সাধনই তাঁহার উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য। উপন্যাস লিখিয়া, পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন করিতে করিতে, কাজের কথাও দুই চারিটি বলিবেন, ইহাই গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং বলিতে পারা

বাবু আজকাল যাহা তিনি এতটা সংশো-ধন, "দুর্গেশনন্দিনী" লিখিবার সময়ে সেই অনুসারেই তাহার মর্ম বুঝা উচিত।

"দুর্গেশনন্দিনী"র প্লট—জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রণয়ের প্রথম সূত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়া থাকি। তাহার বিচারে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। রস থাকিলে চটি ও কর্ণাটী কুরুচিও আমাদের মতে কাব্যের উপযুক্ত বিষয়। তাই হউক, সে সব কথা, আবশ্যক হইবে প্রস্তুত বলিব।

ভাষা—বর্ণনা—ঘটনা।

যাঁহারা পদ্য লিখিয়া থাকেন বা যাঁহারা একটু মন দিয়ে গদ্য পড়িয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন, পদ্যের ন্যায় গদ্যের বিবিধ ছন্দ আছে। পদ্যের ছন্দের নাম আছে, যথা—পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, ইত্যাদি; গদ্যের ছন্দের কোন নাম নাই। নাম না থাকিলেও, উহার বিভিন্নতা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। পদ্যেও যেরূপ লেখকের কোন কোন ছন্দবিশেষে রুচি থাকে, গদ্যে তাহাই। লেখকগণের বিভিন্ন শ্রেণীর ছন্দ নির্দিষ্ট আছে। এ সম্বন্ধে বরং গদ্যের দাবিই অধিকতর। পদ্যের ছন্দ যেন অনেকটা কৃত্রিম, গদ্যের ছন্দ অকৃত্রিম। পদ্যে ছন্দমাত্র শুনিয়া, তাহার লেখক নির্ণয় করা দুরূহ, এমন কি, অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; গদ্যের ছন্দে লেখক অনেক সময়েই পরিচিত হইয়া থাকেন।

আমাদিগের সমালোচ্য "দুর্গেশনন্দিনী"তে বঙ্কিম বাবুর গদ্যছন্দের প্রথম সূচনা দেখিতে পাই। ইহার পরের উপন্যাসে, তিনি যে সকল ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার সকলই "দুর্গেশনন্দিনী"তে আছে। তবে, প্রভেদ এই যে, "দুর্গেশনন্দিনী"র ছন্দ, ইহার পরবর্ত্তী উপন্যাসাবলীর ছন্দ অপেক্ষা অনেকটা অপরিপক্ক। মূল জিনিষ একই।

এক "দুর্গেশনন্দিনী" মধ্যে ন্যূনাধিক ৯।১০ রকমের ছন্দ আছে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধিভয়ে, আমরা এ স্থলে তাহার নমুনা প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। পাঠকবর্গ একটু সামান্য মনোযোগ করিয়া পড়িলে, ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। মনোযোগ করিয়া দেখিলে আরও দেখিতে পাওয়া যায়, এই ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাব অথবা রস প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। ফলতঃ, এই বিভিন্ন ভাবাবলী গ্রন্থকারের মনে যেরূপ বিভিন্ন প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে, স্বতঃই সেইরূপ বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই এক ছন্দ দেখাইয়া ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ গ্রন্থকারের মানসিক ভাব, এমন কি তাঁহার চরিত্রের স্থূল গঠনও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন। গদ্যের ছন্দ একটা অহেতুক উৎপন্ন সামান্য বাহ্যিক বস্তু নহে; ইহা অন্তরের অধীনে গঠিত। তাই, গ্রন্থকারগণ মধ্যে এক এক জনের এক এক রস অবতারণার্থ এক এক প্রকারের স্থায়ী ছন্দ বাঁধা থাকে।

বর্ণনা সম্বন্ধে "দুর্গেশনন্দিনী"র বড় একটা প্রশংসা নাই; তবে, বর্ণনার মধ্যে যে দুই—বহিঃপ্রকৃতির সৃষ্টি প্রকাণ্ডের প্রতি কবির একাগ্র দৃষ্টি—তাহার পরিচয় "দুর্গেশনন্দিনী"তেই পাওয়া যায়। তাহাদের

প্রণয়, বিরহ, ও অন্য প্রকারের মনের কোন গভীর ভাব বর্ণিতে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, অন্তঃপ্রকৃতি বহিঃপ্রকৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে প্রকাশিত হইতে পারে না। ভাবপ্রকাশ তুলনা দ্বারা। যিনি জড় প্রকৃতির অন্তর যত ভাল করিয়া দেখিয়াছেন, জানা থাকিলে অন্তঃপ্রকৃতি তিনি তত উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন। কালিদাসের উপমার সৌন্দর্য্য দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত। বর্ণনাপথ বিশদরূপে প্রকাশ। যাঁহারা মানবের বিচিত্র মনোভাব সুন্দর রূপে বর্ণনা করিতে চাহেন, তাঁহারা যেন কবির চক্ষে, সমালোচকের চক্ষে জড় প্রকৃতির স্থূল বৈচিত্র্য পরিদর্শন করেন। প্রকৃত কবি যেরূপ মনে বিজ্ঞানবিৎ, সেই রূপই জড়জগতের অপূর্ব্ব স্রষ্টা। আমাদিগের মতে, কবিগণই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন পণ্ডিত।

দুর্গেশনন্দিনীর ঘটনার কিছু কিছু ঐতিহাসিক। এই ঐতিহাসিকতা বিস্তৃত নহে। বাঙ্গালী পাঠক সমাজে এরূপ ব্যাপারের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক। বাঙ্গালী বীর নহে সত্য, কিন্তু সকলেই প্রায় বীর রস প্রিয়। অভাবের জন্যও অনেকটা অনুরক্তি জন্মিয়া থাকে। তাই বলি, ভীরু বাঙ্গালী এত বীররস ভাল বাসে। উপন্যাস লিখিবার সময়ে, বাঙ্গালা গ্রন্থের পাঠক সংগ্রহ করা যাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার পক্ষে এইরূপ ঘটনার সাহায্য গ্রহণ কৌশলের কার্য্য, সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র।

কপালকুণ্ডলা।

ইতিবৃত্ত।

এই উপন্যাসখানি বাঙ্গালা ১২৭৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত অবস্থায় মুদ্রিত হয় নাই, প্রায় এক বৎসর যাবৎ উহা গ্রন্থকারের নিকটে থাকিয়া সম্যক সংশোধিত হইতে পারিয়াছিল।

অদ্যাবধি ইহার সাতটি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। প্রথমেই গ্রন্থকার গ্রন্থখানি ভাল করিয়া দেখিয়া দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, পরবর্ত্তী সংস্করণে ইহাতে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই। সম্প্রতি যে সংস্করণ প্রকাশিত হইল, তাহাতে কিছু পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয়। পরিবর্ত্তন অতি সামান্য এবং সেই সামান্য পরিবর্ত্তনও গ্রন্থের একটি মাত্র চরিত্র—নবকুমারকে লইয়া।

প্রকাশক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন, এই উপন্যাসখানি বাহির হওয়া মাত্র বঙ্কিম বাবুর যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল এবং ইতি পূর্ব্বে যাঁহারা বাঙ্গালা গ্রন্থকার বলিয়া খ্যাতাপন্ন ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই যশোজ্যোতিঃ হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে সেই যশ পুনরুদ্ধারের জন্য কোন প্র[illegible] গ্রন্থকার কপালকুণ্ডলা প্রচারিত হই[illegible] মাত্র একবারে দুই খানি নাটক প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও সমালোচনা।

১। কপালকুণ্ডলা।

কাপালিক-প্রতিপালিতা কাননবাসিনী কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির স্নেহময়ী দুহিতা। বালিকাটিকে যেন প্রকৃতি-দেবী সযত্নে বুকে করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা—প্রকৃতির কন্যা সন্তান, অধিকারী ঠাকুরের শিষ্যা ও কাপালিকের প্রতিপালিতা। কপালকুণ্ডলায় মাতৃ অংশ প্রবল। প্রকৃতি স্নেহময়ী—কপালকুণ্ডলাও স্নেহময়ী, তবে অদৃষ্টবাদ-পূর্ণ দেবতা ভক্তি [illegible] কপালকুণ্ডলা অধিকারী ঠাকুর ও কাপালিকের নিকট হইতেই পাইয়াছিল, মাতা তাহাতে প্রতিকূলতা করেন নাই। এই মূল কথাটি মনে রাখিলেই আমরা 'কপালকুণ্ডলা'কে বুঝিতে পারিব।

কপালকুণ্ডলার জীবন-কাব্য গ্রন্থকার তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক ভাগে, তাহার কাননচর কুমারী জীবন প্রকটিত হইয়াছে; অন্য ভাগে তাহার মনুষ্য-লোকে সমাগত নবোঢার অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে—শেষ ভাগে সমাজ-সংসর্গে তাহার যতদূর পরিবর্তন ঘটিতে পারে, তাহার পরিণতি ও পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলা [illegible] প্রকৃত আমাদিগের এ সমাজের ভাষা দ্বারা বর্ণনা করাও অসাধ্য। কপালকুণ্ডলা যে অর্থে যাহা বুঝিত, আমরা সে অর্থে তাহা বুঝি না। কপালকুণ্ডলার অভিধান স্বতন্ত্র এবং আমাদের এই অভিধান স্বতন্ত্র রাখিতে পারাতেই কবির অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ স্বভাব-সন্তান, কই আর ত কোথাও দেখিতে পাই না? দেখাইবে মিরন্দাকে? মিরন্দাও অপূর্ব সৃষ্টি বটে, কিন্তু যে বালিকা কানন-অন্তরে প্রতিপালিতা হইয়াও স্বামীর সহিত খেলিবার সময় 'Come, come and play my lord' বলিতে পারিল, তাহার সহিত কি আমাদিগের এই 'কপালকুণ্ডলা'র তুলনা হয়? দেখাইবে শকুন্তলাকে? কই শকুন্তলায় ও কপালকুণ্ডলায় দেখাইবার চেষ্টা করা হয় নাই। শকুন্তলা তপস্বিনী বটে, কিন্তু মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই সম্যক অভিজ্ঞা। কপালকুণ্ডলা কবির সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। এরূপ চরিত্র, এরূপ মাধুর্য্য আর কোথাও দেখিতে পাই না। ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াও আমাদিগের ভয় হইতেছে, পাছে কোন অযত্ন-বিন্যস্ত কথায় বা বিশ্লেষণে কবির বহুযত্ন-নির্মিত সেই অলৌকিক সৃষ্টি নষ্ট করিয়া ফেলি। কপালকুণ্ডলা বুঝিতে—এ জগৎ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কপালকুণ্ডলার জগৎ—কপালকুণ্ডলার অভিধান—আয়ত্ত না হইলে, কপালকুণ্ডলা বুঝা যায় না।

কপালকুণ্ডলার সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ এক দিন 'সন্ধ্যালোকে' সেই সাগর-নাদী বালুকোপকূলে? যখন আমরা নবকুমারের সহিত [illegible]

সময়-পরিমাণ-বোধ-রহিত হইয়া জলধি-শোভা সন্দর্শনস্তব্ধ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তখন দেখিতে পাইলাম "অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীর-নাদী বারিধি-তীরে, সৈকত-ভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি! কেশভার,—অবেণী-সম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত আগুল্ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না, তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়।"

সেই মূর্ত্তি সেই কালের সেই প্রকৃতির সহিত যেন এক সুরে গাঁথা। নবকুমার এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। "রমণীও নবকুমারের ন্যায় স্পন্দহীন, অনিমেষ লোচনে বিশাল চক্ষুর স্থির দৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। উভয় মধ্যে প্রভেদ এই যে, নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের দৃষ্টির ন্যায়, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল।" নবকুমারের ন্যায় রূপবান যুবক এই কপালকুণ্ডলার প্রথম নয়ন-পথে পড়িল। কপালকুণ্ডলা যে নবকুমারের রূপে আকৃষ্ট হয় নাই, তাহা বলিব না—প্রকৃতি শিশুর ন্যায় রূপে আসক্ত আর কাহার আছে? তবে রূপে আসক্তি জানিত কে? একটা কথা আমাদিগের মধ্যে দেখিতে পাই, কপালকুণ্ডলার দৃষ্টি ছিল না। তাহা থাকিতে পারে না। একটি সুন্দর ফুল দেখিলেও, কপালকুণ্ডলা যেরূপ তদ্দিকে চাহিয়া থাকে, নবকুমারের প্রতি সে ঠিক সেইরূপেই চাহিয়াছিল। এই দৃষ্টিতেই কবি প্রথমে তাহার প্রকৃতি বুঝাইয়া দিলেন। সেই রূপ, সেই অবেণী সম্বদ্ধ কেশভার, সমস্তই যেন প্রকৃতির স্বহস্তে রচিত।

স্নেহময়ী কপালকুণ্ডলার আরও একটি পরিচয় এখানে পাইলাম। প্রকৃতি-প্রতিপালিতা রমণী-হৃদয়ে স্নেহ অপর্য্যাপ্ত। কপালকুণ্ডলা মৃদুস্বরে বলিলেন "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" সে ধ্বনি "যেন হর্ষ-বিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল।" সাগর নাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগর-বসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় উঠিতে লাগিল।" হৃদয়তন্ত্রীর সুর মিলাইতে এরূপ রমণীর এরূপ কণ্ঠস্বরের এইরূপই ক্ষমতা বটে।

কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে পথ দেখাইয়া অন্তর্হিত হইল। তাহার অন্তর্দ্ধানই বা কি সুন্দর। "এক স্থানে একটা ক্ষুদ্র বন পরিবেষ্টিত করিতে হইবে, বনের অন্তরালে গেলে, আর সুন্দরীকে (নবকুমার) দেখিতে পাইলেন না। বন বেষ্টনের পর দেখেন যে সম্মুখে কুটীর।" নবকুমারের ন্যায় আমরাও ভাবিলাম—"একি দেবী—মানুষী না কাপালিকের মায়া মাত্র।"

কিরূপ করিয়া যে, কপালকুণ্ডলা নবকুমারের প্রাণরক্ষা করিলেন—এখানে তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। কপালকুণ্ডলার

প্রত্যেক কার্য্যেই আমরা তাহার যাক্ত উপাদান দেখিতে পাই। সেইরূপ করিয়া নবকুমারকে কাপালিকের সঙ্গে যাইতে নিষেধ করাতে, সেইরূপ করিয়া তীরবৎ বেগে ছুটিয়া যাওয়ায়, সেইরূপ করিয়া মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপে খড়্গহস্তে বনদেবীর ন্যায় নবকুমারের নিকট চলিয়া আসাতে, তাহার হৃদয়খানি, তাহার কার্য্যপ্রণালী অতি সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে লইয়া এক দেবালয়ে গমন করিল। দেবালয়ের অধিকারী তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কপালকুণ্ডলা নবকুমার সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া সমুদ্রতীরে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিল। অধিকারী তাহাকে নিষেধ করিলেন। এই স্থলে আমরা কপালকুণ্ডলার কথাগুলি শুনিতে পাইলাম। এরূপ চরিত্র লইয়া খেলা করা সহজ কথা নহে। প্রকৃতির কন্যাকে লোকালয়ের ভাষা কহাইয়া চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা—অতি সাবধান, অতি শিল্পনিপুণ কারিকরের কার্য্য। আমরা নিম্নে অধিকারী ও কপালকুণ্ডলার সমগ্র কথোপকথন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাহি, আমাদিগের মহাকবি কিরূপ কৌশলে এ ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কপালকুণ্ডলার যেমন হৃদয়খানি, তেমনি কথার প্রণালী, তেমনি কার্য্যাবলী। কপটতার চিহ্ন উহাতে নাই। অধিকারী বলিলেন "যাইও না। ক্ষণেক দাঁড়াও, এক ভিক্ষা আছে।"

"কপালকুণ্ডলা। কি?

অধিকারী। তোমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত মা বলিয়া থাকি, দেবীর পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতে পারি, যে, মাতার অধিক তোমাকে স্নেহ করি। আমার ভিক্ষা অবহেলা করিবে না?"

এরূপ কথার অন্ত হইলে কিরূপ উত্তর বাহির হইতে, সহজেই অনুমান করা যায়। "কবে আমি তোমার ভিক্ষা অবহেলা করিয়াছি, যে আজ আমাকে এরূপ কহিতেছ?" এইরূপই কোন একটা বলিতে যাইত। বাক্যরচনায় অনভিজ্ঞা কপালকুণ্ডলা কিন্তু তাহা বলিল না। সে অধিকারীর কথার উত্তরমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত রহিল। যেটুকু এখানে তাহার বলার দরকার, কেবল মাত্র সেই টুকুই সে বলিল। কপালকুণ্ডলা অধিকারীর উৎকণ্ঠিত হৃদয়ের প্রশ্নোত্তরে কুন্দনন্দিনীর মত অতি ছোট খাট একটি জবাব করিল, সে বলিল "করিব না।" কপালকুণ্ডলা কি ইহা ভিন্ন অন্য উত্তর করিতে পারে? অধিকারী বলিলেন, "আমার এই ভিক্ষা, তুমি আর সেখানে ফিরিয়া যাইও না।" কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিল "কেন?" অধিকারী বলিলেন, "গেলে তোমার রক্ষা নাই।" আবার কপালকুণ্ডলা কপালকুণ্ডলার ন্যায় উত্তর করিল, "তাহা ত জানি।" অধিকারী বলিলেন "তবে আজ জিজ্ঞাসা কর কেন?" কপালকুণ্ডলা "না যাইয়া কোথায় যাইব?" অধিকারী কহিলেন, "এই পথিকের সঙ্গে দেশান্তরে যাও।"

"কপালকুণ্ডলা নীরব হইয়া রহিলেন। অধিকারী বলিলেন, "মা কি ভাবিতেছ?"

কপা। যখন তোমার শিষ্য আসিয়াছিল, তখন তুমি বলিয়াছিলে যে, যুবতীর এরূপ যুবা পুরুষের সহিত যাওয়া অনুচিত, এখন যাইতে বল কেন।

উপাসনা [illegible] যাত্রা করিতে পারে- [illegible], অধিকারীর নিকট কপালকুণ্ডলা [illegible] সম্বন্ধে দুই একটি কথা শুনি- [illegible]। [illegible] এরূপ যুবা পুরুষের সহিত যাওয়া যে অন্যায়, এ কথা কেমনে তাহার মনে হয় নাই, [illegible] এ আপত্তি এখন [illegible] অধিকারী [illegible] এ কথা তাহার অন্তঃকরণে [illegible] হইলেও, কপালকুণ্ডলা [illegible] অধিকারী [illegible] কথা বলিতে [illegible] কপালকুণ্ডলা সেই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিল।

অধিকারী উক্ত [illegible] উত্তর করিয়া কপালকুণ্ডলাকে লইয়া চণ্ডীর শুভাশুভ পরীক্ষা জন্য দেবী [illegible] অর্ঘ্য দিতে গেলেন। [illegible] কপালকুণ্ডলা দেখিলে দেবী অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকারী এখন তাঁহার বৃদ্ধবয়সোচিত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কপালকুণ্ডলাকে কহিলেন, "এ [illegible] তোমাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যায়, [illegible] মঙ্গল। নচেৎ আমিও তোমাকে ইহার সহিত যাইতে দিতে পারি না।"

"বি—বা—হ!" এই কথাটি কপালকুণ্ডলা অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন। [illegible] লাগিলেন, "বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে বিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?"

[illegible] দেখিলে [illegible] কপালকুণ্ডলা [illegible]

এমন বিস্মিত থাকিল। [illegible] দেখিয়াছ।

[illegible] ষোড়শী যুবতীর [illegible] কথাটি শুনি [illegible] ও [illegible] হইয়া [illegible] করিয়া [illegible] বিবাহ [illegible] ধর্ম্মের [illegible] [illegible] দিতা। [illegible] করিতেছেন—তাই [illegible] এই [illegible] করিয়াছেন [illegible] বলিতেছিলেন?

অধিকারী মনে দেখিলেন [illegible] কপালকুণ্ডলা [illegible] দেখি [illegible] রহিলেন [illegible] বলিলেন [illegible]

[illegible] কাপালিককে [illegible] করিতে কপালকুণ্ডলার মন [illegible] না। "তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন?" অধিকারী [illegible] উত্তর করিলেন। কপালকুণ্ডলাকে তাঁহার [illegible] আপনি [illegible] দিলেন। কপালকুণ্ডলা [illegible] কতদূর বুঝিল জানি না—[illegible] থাকিল না। [illegible] হইতে [illegible] যুবক [illegible] যুবক অধিকারীর [illegible] স্বীকৃত হইল। [illegible] অধিকারী [illegible] করিয়া [illegible] এ বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। [illegible] নবকুমারের সহিত [illegible] বিবাহ [illegible]

[illegible] করিয়াছি।

[illegible] আলোকে কপালকুণ্ডলা [illegible] প্রদান করিলেন—অথচ [illegible] কপালকুণ্ডলা নিতান্ত [illegible] প্রতিমা [illegible] হইত [illegible] ভীত হইলেন [illegible] বশিষ্ঠ প্রথম নিবেদন [illegible] তোমার বর্ণ [illegible] অতএব [illegible] বল।"

[illegible] তাহাই করিলেন। অধি-[illegible] বিবাহ গ্রহণকার্য্যে কপালকুণ্ডলা কাঁদিতে লাগিলেন। [illegible] এ মাত্র এবং [illegible] হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলার জীবন নাটকের [illegible] পরিসমাপ্ত হইল। এখন একবার [illegible] এই কুমারী [illegible] পর্য্যালোচনা করা যাউক।

কপালকুণ্ডলা বাল্যকালে [illegible] অপহৃত হইয়া [illegible] তাহাদের [illegible] কারণ [illegible] হইয়াছে [illegible] এ কথা আমরা [illegible] বলিয়াছিলেন—আমরা জানি না। [illegible] কপালকুণ্ডলার মুখে শুনিয়া [illegible] অধিকারীকে স্বীকার করিয়া [illegible] হইবে [illegible] কথা [illegible] হইয়াছিল। [illegible] জাগা হইল [illegible] দিনের [illegible] বল, তুমি [illegible] না? [illegible] হইয়া থাকিলে, [illegible] কথা জানিত [illegible] কাপালিক [illegible] দিয়া [illegible] হইতে হইবে [illegible] নিকট [illegible] কাপালিকের

হইতে, [illegible] কপালকুণ্ডলার [illegible] এরূপ [illegible] আমরা অনুমান করি, [illegible] অনুভূত [illegible] কপালকুণ্ডলা [illegible] এ কথা জানি-তেন। [illegible] তাহার হৃদয় [illegible] কপালকুণ্ডলার সমগ্র [illegible] এই একটি কথার উপর [illegible] করে [illegible] না যায় যে কপাল-কুণ্ডলা এ [illegible] ও [illegible] তাহা [illegible] অন্তঃসলিলা [illegible] তাহার হৃদয়খানিতে যেন একটি দুঃখের [illegible] প্রবাহিত ছিল। [illegible] উহা [illegible] রক্ত [illegible] আবিষ্ট [illegible] ছিল। এই দুঃখের ভারে [illegible] থাকাতেই তাহার [illegible] হইয়াছিল। [illegible] এই জন্য [illegible] করিতে পারে নাই। [illegible] কপাল-[illegible] আর [illegible] একটি [illegible] না—সেই [illegible] প্রতি [illegible] হইয়া [illegible] দিনে [illegible] তাহা [illegible] নহে। [illegible] কপালকুণ্ডলার [illegible] নাই [illegible] দিতে [illegible] না।

কপালকুণ্ডলা [illegible] নিজস্বই [illegible] বাড়ন্ত হইয়াছিল। [illegible] কপালকুণ্ডলা [illegible] [illegible] হাঁসিতে [illegible] স্বভাবজ [illegible] হইয়াছিল; বাহিরে স্বাধীনতা, [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] গুলি [illegible] হইয়াছিল। আবার উপর, [illegible] কাপালিকের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হৃদয় ভরিয়া [illegible] অধিকারী [illegible] তাহার উপদেশে—সেই স্নেহ উচ্ছ্বসিত উঠিত।

এদিকে [illegible] [illegible] বর্ণী [illegible] কপালকুণ্ডলার স্বাধীনতায় আসক্তি এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে কিছুতেই, আমাদিগের সামাজিক রমণীবৃন্দের ন্যায় সমাজ-নিয়মাধীনা হইয়া একমাত্র স্বামীকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিল না। এই অনুরক্তি ও সেই স্নেহ—অনুরাগ ও ভৈরবীভক্তি—যুক্ত হইয়া ভবিষ্যৎ কপালকুণ্ডলার অদৃষ্ট নির্মাণ করিল। এই [illegible] [illegible] তাহার ভবিষ্যজ্জীবনে প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা তাহা ক্রমে দেখাইতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।—

কপালকুণ্ডলার জীবন-কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা কপালকুণ্ডলা [illegible] মূর্তি [illegible] নিম্ন বর্ণিত অবস্থায় নিম্নবর্ণিত রূপে দেখিতে পাইলাম।

"কপালকুণ্ডলা [illegible] [illegible] ভূমিতলে একাকিনী বসিয়াছিলেন। একটি [illegible] প্রদীপ জ্বলিতেছে [illegible] অবস্থা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল [illegible] কপালকুণ্ডলার [illegible] [illegible] দিলেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইল [illegible] [illegible] নিমীলোচনে দেখিতে [illegible] [illegible] কোন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মোচন করিলেন না। [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] মুক্ত করিয়া [illegible] কপালকুণ্ডলাকে পূর্ণ [illegible] [illegible] কপালকুণ্ডলা [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] করিতে [illegible] 'এ কি হইতেছে?' [illegible] তাঁহার [illegible] উত্তর করিলেন না।"

এস্থলে আমরা কপালকুণ্ডলাকে [illegible] বিমুগ্ধ নবকুমারের চক্ষে দেখিলাম [illegible] রূপাভিমানিনী, জগতে অতুলনীয় রূপবতী [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বিনী [illegible] [illegible] চক্ষে তাঁহাকে দেখিলাম। এ রূপ দেখিয়া সে অভিমানিনী [illegible] হইল—আপনার [illegible] [illegible] হইতে মোচন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে সাজাইয়া দিল। [illegible] বর্ণনা, [illegible] [illegible] বর্ণনার পরাকাষ্ঠা [illegible] [illegible] কেবল [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible] উদ্ধৃত করি নাই। ইহাতে [illegible] [illegible] কিছু আছে। সেটি [illegible] মতির [illegible] দেখিয়া কপালকুণ্ডলার [illegible] অপূর্ব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] বিনা [illegible] সেখানে [illegible] তুলনাভাব। [illegible] কপালকুণ্ডলা [illegible] কিছু [illegible] শুনিতে পাইল না। তাই কপালকুণ্ডলা কিছু বালিকা [illegible] অস্থির ভাব দেখিয়া বিস্মিত [illegible] অথবা হইল না।

[illegible] সব কারণে [illegible] কিছু যায় [illegible] নিঃসম্পর্ক ভাবে চুপ করিয়া [illegible] হাতে কপালকুণ্ডলার [illegible] সম্পূর্ণ বজায় রহিল।

[illegible] হইতে যাইতে কিরূপে [illegible] জিজ্ঞাসুকে [illegible] তাহা [illegible] একবার [illegible] পাইবেন, কপালকুণ্ডলা কেমন এখানে অবিচলিত ছিল। [illegible] তুমি [illegible] আমি [illegible] বেলা এই দুইটি [illegible] সামঞ্জস্য [illegible] করিয়াছে। [illegible] সহিত মানুষের মনের [illegible] কি সম্বন্ধ, তাহা কপালকুণ্ডলা জানিবে কিরূপে?

[illegible] মানসে [illegible] কপাল [illegible] কিছু [illegible] উচিত [illegible] গর্ভিত [illegible]।

কপালকুণ্ডলা [illegible] মৃণ্ময়ী [illegible] এই রজনী [illegible] শ্যামাসুন্দরী [illegible] কখন কখন [illegible]।

শ্যামাসুন্দরী দুই করে [illegible] কেশ [illegible] তোমার এ [illegible] বাঁধিবে না?

মৃণ্ময়ী কেবল [illegible] (কপাল-কুণ্ডলাকে আমরা [illegible] এখন হাসিতে দেখি নাই।) শ্যামাসুন্দরীর হাত হইতে কেশগুলি টানিয়া লইলেন।

শ্যামাসুন্দরী আবার কহিলেন, "ভাল [illegible] সাধ পুরাও। একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কত দিন যোগিনী থাকিবে?"

মৃ। যখন এ [illegible] সন্তানের সহিত সাক্ষাৎ [illegible], তখন ত আমি যোগিনীই [illegible]।

শ্যা। এখন আর থাকিতে পারিবে না।

মৃ। কেন পারিব না?

শ্যা। কেন দেখিবি? [illegible] যোগ ভাঙ্গিব। পরশপাতর কাহাকে বলে জান?

মৃণ্ময়ী কহিলেন, "না।" *

শ্যা। পরশপাতরের স্পর্শে রাঙ্গও সোনা হয়।

* [illegible]

[illegible] তাহাতে কি?

[illegible] মেহেরউন্নিসার [illegible]

[illegible] সে কি?

[illegible] প্রথম [illegible] [illegible] হইল [illegible] বলিয়ছি,—

[illegible] ছিল [illegible]

[illegible] কি বেড়াজল।

[illegible] চম্পা [illegible]

[illegible] বেড়ো [illegible] বোলে [illegible]

[illegible] কি [illegible]

[illegible] কহিলেন, [illegible]

[illegible]

[illegible] তাহা হইলেই বা কি?

[illegible]

[illegible]

[illegible] তাহার [illegible] বলি [illegible] উত্তর [illegible]

[illegible] আছে—[illegible]

[illegible] কিছু [illegible]

শ্যামাসুন্দরী কিছু বিস্মিত হইলেন [illegible]

[illegible] কষ্ট হইতেছে [illegible]

[illegible] নাই [illegible]

[illegible] কহিলেন [illegible]

[illegible] শ্যামাসুন্দরী [illegible]

[illegible] কহিলেন [illegible]

[illegible] কপালে আছে [illegible]

[illegible] কহিলেন, [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] একবার [illegible] [illegible] তাহা [illegible] নিকট [illegible]

[illegible]

[illegible] কাহারও [illegible] বাহির হইয়াছিল [illegible] অবিরত [illegible] ছিল।

[illegible] কপালকুণ্ডলা অন্যমনা হইয়া [illegible] নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করেন। ইহার [illegible] যে তাহার [illegible] বেশী [illegible] হইল, তাহা বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে একটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। [illegible] উভয়ে উভয়ের প্রতি [illegible] করিয়া [illegible]। প্রথমে কপালকুণ্ডলা মদনপত্র [illegible] [illegible] কপালকুণ্ডলা [illegible] [illegible] আগন্তুক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?"

[illegible] সেই অদ্ভুত [illegible] পরিচয় [illegible] কি মনোহর [illegible] [illegible] আলোক [illegible] করে। [illegible] রজনী [illegible] [illegible] এবং [illegible] অনেক [illegible] [illegible] করে। [illegible] [illegible] দিন [illegible] [illegible] ছিলেন। [illegible] কথা মনে পড়িল।

কুমারীর সহিত বিবাহিতার, কানন-বাসিনী যোগিনীর সহিত সংসারবাসিনী গৃহিণীর, কপালকুণ্ডলার সহিত মৃণ্ময়ীর—কি অপূর্ব্ব সংঘাতই দেখিলাম। সত্যই কপালকুণ্ডলা কতক দূর গৃহ-রমণীর স্বভাব সম্পন্না হইয়াছিলেন।” তিনি ব্রাহ্মণ-কুমারের প্রশ্নের সহসা উত্তর করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণকুমার কপালকুণ্ডলাকে নিরুত্তর দেখিয়া গাম্ভীর্য্যের সহিত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কপালকুণ্ডলা তুমি রাত্রে নিবিড় বনমধ্যে কি জন্য আসিয়াছ?’ অজ্ঞাত রাত্রিচর পুরুষের মুখে আপন নাম শুনিয়া কপালকুণ্ডলা অবাক হইলেন, কিছু ভীতাও হইলেন, সুতরাং সহসা তাঁহার মুখ হইতে কোন উত্তর বাহির হইল না। ব্রাহ্মণ-বেশী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন ‘তুমি আমাদিগের কথা বার্ত্তা শুনিয়াছ?’ সহসা কপালকুণ্ডলা বাক্-শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি উত্তর না দিয়া কহিলেন, ‘আমিও তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, এ কানন মধ্যে তোমরা উভয়ে এ নিশীথে কি কুপরামর্শ করিতেছিলে?’

এই এক সংবাদ কাল ধারায় বিন্দু বিন্দু বাতাসে যে এক খানি তরল মেঘ সঞ্চিত হইয়া কপালকুণ্ডলার স্বভাবসূর্য্যকে আচ্ছাদন করিতেছিল, সহসা তাহা নিরাকৃত হইল। কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। মৃণ্ময়ী আবার কপালকুণ্ডলা হইল। অজ্ঞাতপুরুষের নিকট কোন গৃহ-রমণীর কি এইরূপ কথা বলিত? কিন্তু কপালকুণ্ডলা ত গৃহ-রমণী নহে, যোগিনী; এখন মৃণ্ময়ী মৃতা হইয়াছে।

ইহার পরে ভীতা হইয়াও কপাল-কুণ্ডলা কিরূপ সাহসের পরিচয় দিয়া-ছিলেন, তাহা আমাদিগের বলিবার আবশ্যকতা নাই। তাহা কপালকুণ্ডলারই প্রকৃতি। কপালকুণ্ডলাকে গৃহমধ্যে বসাইয়া রাখিয়া যখন ব্রাহ্মণ-বেশী অন্যত্র বিলম্ব করিতে-ছিল, কপালকুণ্ডলা কিছু সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

তখন আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় অসীম হইয়া আসিতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা দ্রুত পদে গমন করিতে লাগিলেন। পথে মনুষ্য পদধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, ব্রাহ্মণবেশী তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেছেন। কিন্তু কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। ভীত হইয়া তিনি আরও দ্রুতপদে চলি-লেন। কিন্তু গৃহপ্রাপ্ত হইতে না হইতেই প্রচণ্ড ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কপাল-কুণ্ডলা ভিজিতে ভিজিতে বাহিঃপ্রকোষ্ঠ মধ্যে উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন—বিদ্যুদালোকে দেখিতে পাইলেন, প্রাঙ্গণ ভূমিতে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়াই তাহাকে চিনিতে পারি-লেন। সে সাগরতীরবাসী সেই কাপা-লিক। কপালকুণ্ডলার জীবনের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য এই স্থানে পরিসমাপ্ত হইল।

বিদ্যুদালোকে কাপালিক মূর্ত্তি দর্শন হইতে, শ্মশান ভূমিতে নীত হওয়া পর্য্যন্ত কয়েকটি ঘটনায় কপালকুণ্ডলার জীবনের আর এক দৃশ্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই বিবিধ ঘটনারাশি যেন একই সূত্রে বাঁধা। সেই কাপালিক দর্শন, সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত, [illegible] সহিত কথোপকথনে কপাল-

কুণ্ডলার সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। কপালের সেই অদ্ভুত ভৈরবীমূর্ত্তি দর্শন, তাহার আজ্ঞা শ্রবণ, আর নবকুমারের সেই হৃদয়-ভাব—সবগুলি মিলিয়া একটি বিচিত্র চিত্র হইয়াছে।

যখন কপালকুণ্ডলা একাকিনী উপ-বনে ওখানে বনমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার কুমারী জীবনের পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইতেছিল। "বালিয়াড়ির শিখরে যে, সাগর-বারি-বিন্দু-সংস্পৃষ্ট মলয়ানিল তাঁহার অলকদামমধ্যে ক্রীড়া করিত, তাহা মনে পড়িল; অমল নীলানন্ত গগনপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, সেই অমল নীলানন্ত গগনরূপী সমুদ্র মনে পড়িল।" এই জাগরিত স্মৃতি লইয়া কপালকুণ্ডলা যখন দেখিতেছিলেন, নিবিড় বনমধ্যে আলো জ্বলিতেছে—তখন নিঃসন্দেহই তাঁহার সেই কাপালিকের কথা মনে পড়িতেছিল। কাপালিকের সেই ভয়ানক বীভৎস কাণ্ড মনে করিতে করিতে যখন কপালকুণ্ডলা এখানেও মৃত্যু সম্বন্ধীয় কথোপকথন শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার সমস্ত পূর্ব্বজীবনটি কাপালিকের সহিত একত্রিত হইয়া নিশ্চয়ই তাঁহার মনে উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণ-বেশী লুৎফউন্নিসার সহিত কথোপকথনে অন্যরূপ ভাবে আসিয়া এতক্ষণ সেই চিন্তাগুলিকে চাপা দিয়া রাখিয়াছিল। তাই নিশীথে একাকিনী শয়ন করিয়া লুৎফউন্নিসার মুখ হইতে ভীত চিত্তে পলাইয়া আসিয়া, উত্তুঙ্গ তুমুল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যখন বিদ্যুতালোকে কাপালিকমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলেন—[illegible] নদী প্রবাহের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন একেবারে জলরাশি সবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, কপালকুণ্ডলায় সেই চিন্তাগুলি তদ্রূপ বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রাণ ও অন্তরে প্রবাহিত হইল। "কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ধীরে ধীরে শয়নাগারে আসিলেন। ধীরে ধীরে পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন।" আমাদিগের কবি এইরূপে ধীরে ধীরে কপালকুণ্ডলার সেই অন্যমনস্ক আত্ম-বিস্মৃত চিন্তা দৃষ্টান্ত আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।

কপালকুণ্ডলা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কাপালিকের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়া তিনি চলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল। কাপালিক নিবিড় বনমধ্যে যে সকল পৈশাচিক কার্য্য করিতেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল, তৎকৃত ভৈরবী পূজা, নবকুমারের বন্ধন এ সকল মনে পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা শিহরিয়া উঠিলেন। অদ্যকার রাত্রের সকল ঘটনাও মনোমধ্যে আসিতে লাগিল।

"পূর্ব্বদিকে উষার মুকুট-জ্যোতিঃ প্রকটিত হইল; তখন কপালকুণ্ডলার অল্প তন্দ্রা আসিল। সেই অল্পনিদ্রায় কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তিনি সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সাগর-হৃদয়ে তরণী আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। তরণী সুশোভিত; তাহাতে বসন্ত রঙ্গের পতাকা উড়িতেছে; নাবিকেরা ফুলের মালা গলায় দিয়া বাহিতেছে। রাধা শ্যামের অনন্ত প্রণয় গীত করিতেছে। পশ্চিম গগন হইতে সূর্য্য স্বর্ণধারা বৃষ্টি করিতেছে; স্বর্ণধারা পাইয়া সমুদ্র হাসিতেছে; আকাশ-মণ্ডলে মেঘখণ্ড সেই স্বর্ণ বৃষ্টিতে ছুটাছুটি করিয়া স্নান করিতেছে। অকস্মাৎ

রাত্রি হইল, সূর্য্য কোথায় গেল, স্বর্ণ মেঘ সকল কোথায় গেল। নিবিড় নীল কাদম্বিনী আসিয়া আকাশ ব্যাপিয়া ফেলিল; আর সমুদ্রে দিক নিরূপণ হয় না, নাবিকেরা তরি ফিরাইল। কোন দিকে বাহিবে স্থির করিতে পারে না। তাহারা গীত বন্ধ করিল, গলার মালা সকল ছিঁড়িয়া ফেলিল। বসন্ত রঙ্গের পতাকা আপনি খসিয়া জলে পড়িয়া গেল। বাতাস উঠিল; বৃক্ষ প্রমাণ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তরঙ্গ মধ্য হইতে একজন জটাজূট-ধারী প্রকাণ্ডাকার পুরুষ আসিয়া কপালকুণ্ডলার নৌকা বাম হস্তে তুলিয়া সমুদ্র মধ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল। এমত সময়ে, সেই ভীম-কান্ত-শ্রী-ময় ব্রাহ্মণ-বেশধারী আসিয়া তরি ধরিয়া রহিল। সে কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিল 'তোমায় রাখি কি নিমগ্ন করি?' অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার মুখ হইতে বাহির হইল 'নিমগ্ন কর।' ব্রাহ্মণ-বেশী নৌকা ছাড়িয়া দিল। তখন নৌকাও শব্দময়ী হইল, কথা কহিয়া উঠিল। নৌকা কহিল, 'আমি আর এ ভার বহিতে পারি না, আমি পাতালে প্রবেশ করি।' ইহা কহিয়া নৌকা তাহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল।"

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে কবি Byron হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন "I had a dream which was not all a dream."

এই স্বপ্নের পর নবমী [illegible] কপাল-কুণ্ডলা [illegible] হইলেন।

নিদ্রা হইতে উঠিয়া কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন-দৃষ্ট ব্রাহ্মণকুমারের এক পত্র পাইলেন। ব্রাহ্মণ-বেশী সন্ধ্যার পরে কুঞ্জে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছে। সেই ব্রাহ্মণ-কুমার, সেই নিভৃত কানন-প্রদেশ,—কপালকুণ্ডলা সেই বনবাসিনী যোগিনী থাকিলেও বুঝি, কদাচ এ সাহস করিতে পারিতেন না। কিন্তু গত রাত্রির নিদারুণ স্বপ্ন কপাল-কুণ্ডলার অদৃষ্টবাদ, ভৈরবী-ভক্তি প্রভৃতির সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহাকে আর একরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণ-বেশীর সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন। গ্রন্থকার লিখিলেন, "বিজ্ঞ ব্যক্তি এরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন কিনা তাহাতে সন্দেহ; কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির সিদ্ধান্তের সহিত আমাদিগের সংস্রব নাই। কপাল-কুণ্ডলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না—সুতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না। কৌতূহল-পরবশ রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীম-কান্ত-রূপরাশি-লোলুপ যুবতীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, নৈশ বন-ভ্রমণ-বিলাসিনী সন্ন্যাসী পালিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন; ভবানী ভক্তি-ভাববিমোহিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন; জলন্ত বহ্নি শিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।"

সন্ধ্যাকালে কপালকুণ্ডলার সহিত পদ্মাবতীর সাক্ষাৎ হইল। পদ্মাবতী আদ্য-পূর্ব্বিক আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। যে অভিপ্রায়ে তিনি এখন সপ্তগ্রামে আসিয়াছেন, সে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। [illegible] মনের অভিপ্রায় ও তাঁহার সহিত পদ্মার সাক্ষাৎ বৃত্তান্ত সমস্ত কপালকুণ্ডলা শুনিলেন। কাপালিক যে কথা [illegible] পদ্মাবতীকে বলিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলা তাহাও শুনিলেন। [illegible] এইরূপ ;— সন্ন্যাসী প্রতিজ্ঞা করিয়া কপা-